হাতেকলমে

নীচের টেবিলটা পূরণ করো। (প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও)

ঘটনা	কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপ বদলাচ্ছে
ইলেকট্রিক ইস্ত্রি চালু করা হলো	তড়িৎ শক্তি ⟶ তাপ শক্তি
মোমবাতি জ্বালানো হলো	
ব্যাটারিচালিত রেডিয়ো চালানো হলো	
কয়লা পোড়ানো হলো	
সৌর কুকার চালু করা হলো	
মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হলো	
একটা স্টিলের পাত্র মাটিতে পড়ে ঝন ঝন শব্দ হলো	
তারাবাজি জ্বালানো হলো	
একটা ক্যাম্বিস বলকে ওপরে ছোঁড়া হলো	
একটা ক্যাম্বিস বলকে ওপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো	

ওপরের আলোচনা থেকে তাহলে বলা যায় শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। শুধুমাত্র এক প্রকার শক্তি অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে মাত্র। একে শক্তির নিত্যতা সূত্র বলে।

শক্তির উৎস

তোমরা জেনেছ যে আমাদের প্রতিদিনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আমরা খাবার থেকে পাই।

এবার প্রতিদিন তুমি যা যা খাও তার কয়েকটা নীচে লেখো।

.....,

.....।

এখন ওই খাবারের মধ্যে তুমি যা যা প্রাণীদেহ আর উদ্ভিদ থেকে পাও তা নীচের সারণিতে লেখো।

প্রাণীজ উৎস	উদ্ভিজ্জ উৎস

প্রাণীজ উৎসের খাবারগুলো যে যে প্রাণীর দেহ থেকে আসে সেই প্রাণীদের মধ্যে যারা সরাসরি উদ্ভিদ খায় এসো তাদের তালিকা করি।

.....,

.....।

বাকি প্রাণীরা অন্য কোন প্রাণীদের খায় আর তারাই বা কী খায়?

এভাবে চিন্তা করতে থাকো। দেখো তো, শেষে তুমি সেই উদ্ভিদকেই পাচ্ছ কিনা?

তাহলে একথা বলা যায় পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীর খাদ্যের উৎস সবুজ উদ্ভিদ।

তোমরা তো জানো সবুজ উদ্ভিদ সূর্যের আলো ও অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে নিজের দেহে খাদ্য তৈরি করে।

ভেবে দেখো তো উদ্ভিদ তার দেহে যে খাদ্য তৈরি করে সেই খাদ্যের শক্তির উৎস কী?

তাহলে, দেখা গেল পৃথিবীতে সব খাবারের শক্তির উৎস সূর্য। সূর্যের সৌর শক্তি খাদ্যের মধ্যে রাসায়নিক শক্তি বা স্থিতিশক্তি রূপে জমা থাকে।

আমরা যে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করি তা উৎস ভেদে মূলত দু-রকম

(1) তাপবিদ্যুৎ শক্তি ও (2) জলবিদ্যুৎ শক্তি।

ভেবে লেখো দেখি, মূলত কী কী পুড়িয়ে আমরা তাপবিদ্যুৎ শক্তি পাই?

ক) ..... খ) .....

এখন বলো এই উৎসগুলো আমরা পাই কোথা থেকে? সেখানে এগুলো এল কোথা থেকে?

বহু কোটি বছর আগের গাছপালার অবশেষ মাটির নীচে চাপা পড়ে ধীরে ধীরে গরমে আর চাপে 'কয়লা'য় পরিণত হয়। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ পাললিক শিলার নীচে থাকতে থাকতে বহু কোটি বছর পরে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিণত হয়। পেট্রোলিয়াম থেকেই আমরা ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি জ্বালানি পাই।

তাহলে, কয়লা ও পেট্রোলিয়ামে জড়ো হওয়া শক্তির উৎসও সূর্য।

এবার রইল জলবিদ্যুৎ শক্তি।

খরস্রোতা নদীর স্রোতে টারবাইন যন্ত্র বসিয়ে দিলে কী হবে? টারবাইনটা যখন খুব জোরে ঘুরবে, তখন সেই যান্ত্রিক শক্তির রূপ বদলে আমরা পাব বিদ্যুৎ শক্তি।

বৃষ্টি বা পর্বতের মাথায় জমে থাকা বরফই বা কী করে তৈরি হলো?

চিন্তা করো, বৃষ্টি তৈরি আর পর্বতের উপর জমা জলের উৎস যে জলীয় বাষ্প, সেই জলীয় বাষ্প তৈরিতে সূর্যের কী ভূমিকা।

তাহলে, দেখা গেল জলবিদ্যুৎ শক্তি তৈরিতেও মূল ভূমিকা পালন করে সূর্য।

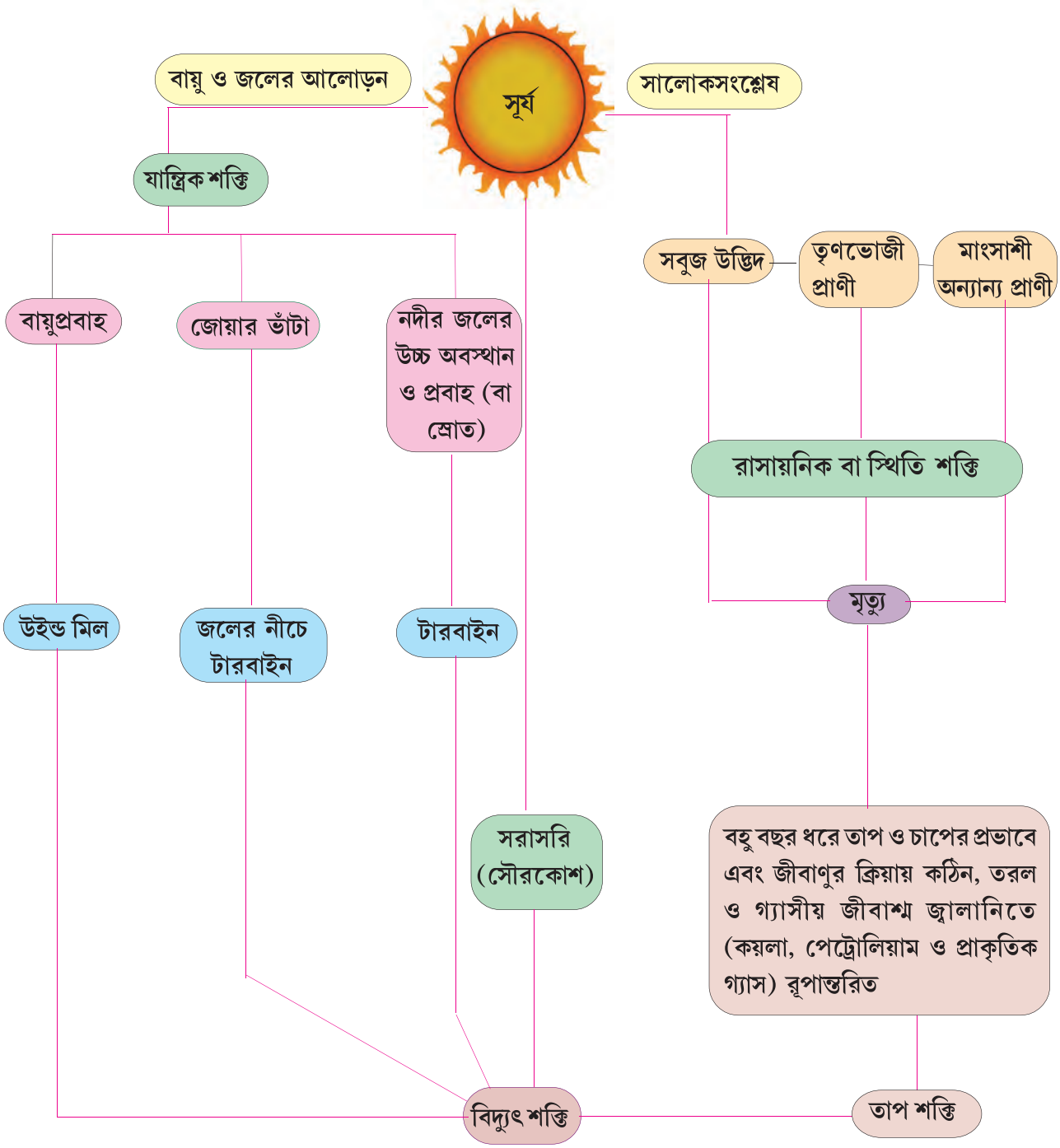
সূর্য
বায়ু ও জলের আলোড়ন
সালোকসংশ্লেষ
যান্ত্রিক শক্তি
সবুজ উদ্ভিদ
তৃণভোজী প্রাণী
মাংসাশী অন্যান্য প্রাণী
বায়ুপ্রবাহ
জোয়ার ভাঁটা
নদীর জলের উচ্চ অবস্থান ও প্রবাহ (বা স্রোত)
রাসায়নিক বা স্থিতি শক্তি
মৃত্যু
উইন্ড মিল
জলের নীচে টারবাইন
টারবাইন
সরাসরি (সৌরকোশ)
বহু বছর ধরে তাপ ও চাপের প্রভাবে এবং জীবাণুর ক্রিয়ায় কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় জীবাশ্ম জ্বালানিতে (কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস) রূপান্তরিত
বিদ্যুৎ শক্তি
তাপ শক্তি

শক্তি শৃঙ্খলের ধারণা

তোমরা আগে প্রাণীজ উৎসের খাদ্য তালিকা তৈরি করেছিলে। সেখানে দেখেছো কিছু প্রাণীরা সরাসরি উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

এরা হলো প্রথম শ্রেণির খাদক।

এবার দেখো তো বাকি প্রাণীদের মধ্যে এমন কোনো প্রাণী পাও কিনা যারা প্রথম শ্রেণির খাদকদের খায়।

এসো তাদেরও একটা তালিকা তৈরি করি। .....।

যাদের তালিকা তৈরি হলো তারা হলো দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক।

আবার এমন কিছু প্রাণীও আছে যারা সরাসরি উদ্ভিদকে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির খাদককেও খায়। এসো, এমন কয়েকটি প্রাণীর তালিকা তৈরি করি।

মানুষ, কাক .....।

এরা হলো সর্বভুক।

উদ্ভিদ নিজেই নিজের খাদ্য দেহে তৈরি করে ..... এর আলোর সাহায্যে। (ফাঁকা জায়গায় উপযুক্ত শব্দ বসাও)

নিজের দেহে নিজেই খাদ্য উৎপন্ন করে বলে উদ্ভিদকে বলে উৎপাদক।

তাহলে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় শক্তি পায় কোথা থেকে ?

.....।

উদ্ভিদকে সরাসরি খায় **প্রথম শ্রেণির খাদক**। তাহলে প্রথম শ্রেণির খাদক কোথা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি পায়?

.....।

প্রথম শ্রেণির খাদককে খাবার হিসাবে খায় **দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক**। তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি কোথা থেকে পায়? .....।

তাহলে যারা সর্বভুক তারা তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি কোথা থেকে পায়? .....।

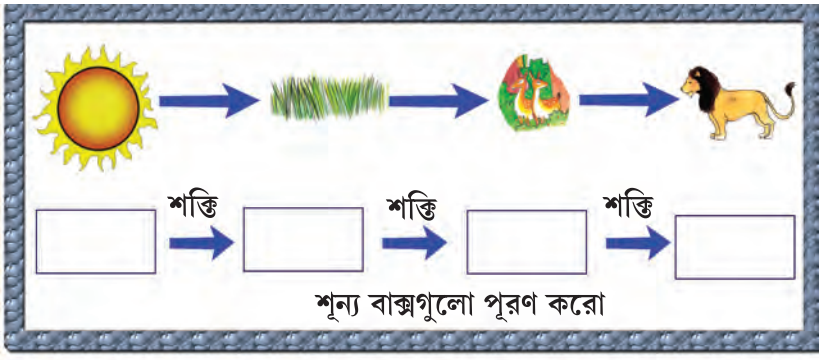

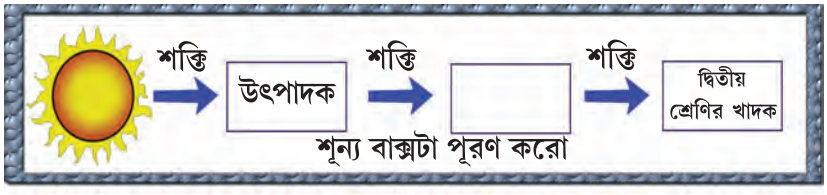

এসো, এবার একটা খাদ্য শৃঙ্খল (chain) তৈরি করি।

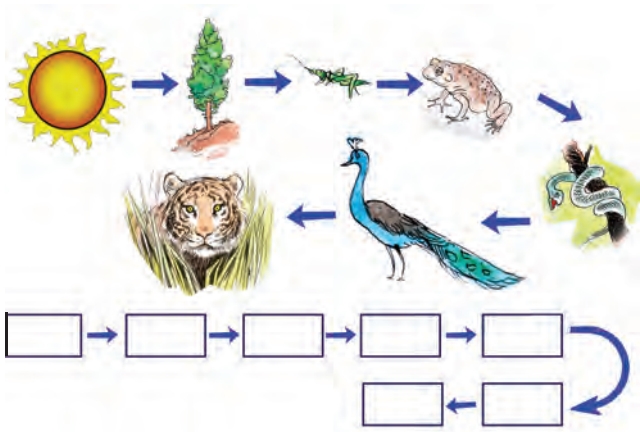

তাহলে তোমরা দেখতে পেলে যে খাদ্যশৃঙ্খলে একটা প্রাণী একবার অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। তখন সে খাদক। আবার পরে সেই প্রাণীটা নিজেই হয়তো অন্য কোনো প্রাণীর খাদ্য হবে। এরকম পর্যায়ক্রমিক খাদ্য-খাদক সম্পর্কযুক্ত শৃঙ্খলকেই বলা হয় খাদ্য শৃঙ্খল। উপরের খাদ্য শৃঙ্খলে যুক্ত এক জীব থেকে অন্য জীবে পর্যায়ক্রমে শক্তি প্রবাহিত হয়।

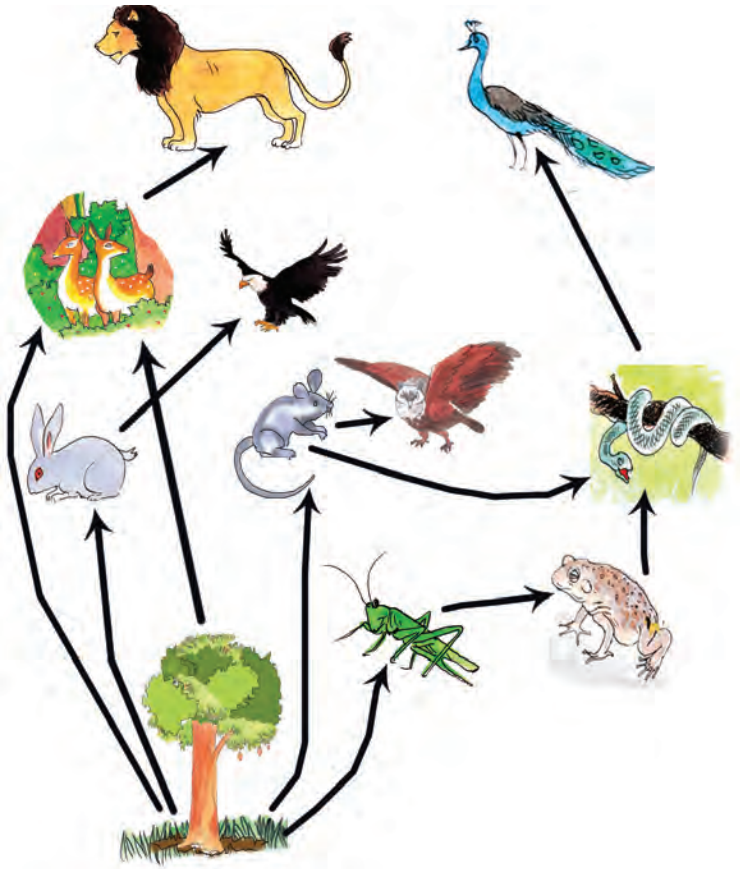

ওপরের ছবিটা ভালো করে দেখো। ওপরের ছবিতে কতগুলো খাদ্যশৃঙ্খল দেখতে পাচ্ছ, গুনে লেখার চেষ্টা করো।

.....

ছবিতে তাহলে কী দেখলে? একই উদ্ভিদ বা প্রাণী, খাদ্য-খাদক সম্পর্কে যুক্ত হওয়ায় খাদ্যশৃঙ্খলগুলি একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা জালের মতো দেখতে ছবি তৈরি করেছে। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন খাদ্যশৃঙ্খলগুলো মিলে জালের মতো যে ছবি তৈরি করে সেটাই হলো খাদ্যজাল।

এবারে নীচের ছবিটা ভালো করে দেখো।

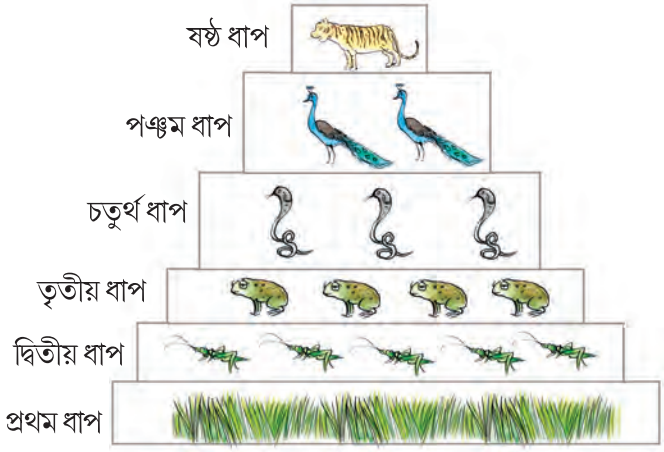

1. প্রথম ধাপে যারা আছে তাদের প্রকৃতি কী? .....।

2. দ্বিতীয় ধাপে যারা আছে তাদের প্রকৃতি কী? প্রথম শ্রেণির খাদক।

3. তৃতীয় ধাপে যারা আছে তাদের প্রকৃতি কী? .....।

4. চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ধাপে যারা আছে তাদের প্রকৃতি কী কী? .....।

5. প্রথম ধাপ আর দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ ধাপে যেসব জীবেরা আছে তাদের মধ্যে কী মিল বা অমিল আছে? সেগুলি লেখার চেষ্টা করো। .....।

6. দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ ধাপে যেসব জীবেরা আছে তাদের মধ্যে কী মিল আছে সেগুলো ভেবে লেখার চেষ্টা করো।

তোমরা দেখতে পেলে যে খাদ্যশৃঙ্খলের জীবদের এক একটা আলাদা আলাদা ধাপে রাখা হয়েছে। একটা শৃঙ্খলের উদ্ভিদ আর প্রাণীদের এইভাবে নীচ থেকে ওপরে ধাপে ধাপে সাজানোর ফলে একটা ছবি তৈরি হয়। এই ছবিটাই হলো খাদ্য পিরামিড।

খাদ্য পিরামিডের এক একটা ধাপই হলো এক একটা পুষ্টিস্তর বা ট্রফিক লেভেল (Trophic level)।

প্রাণীরা খাবার কেন খায়? শক্তি পাওয়ার জন্য। আচ্ছা বলো তো প্রথম ধাপে উদ্ভিদের দেহে যা শক্তি জমা ছিল ঘাসফড়িংরা উদ্ভিদদের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে কি সেই শক্তি পুরোটাই পায়? আবার একটা ঘাসফড়িং-এর দেহে যতটা শক্তি জমা আছে, একটা ব্যাং ওই ঘাস ফড়িংকে খেয়ে কি সেই শক্তির পুরোটাই পাচ্ছে?

তোমার কী মনে হয় তা খাতায় লেখো। .....।

আসলে উদ্ভিদেরা নিজেদের দেহে খাদ্য তৈরি করার সময় সূর্যের শক্তির যে অংশ শোষণ করে, তার প্রায় দশ শতাংশ (10%) নিজেদের দেহে জমা করে রাখতে পারে বা তাদের দেহ গঠনের কাজে লাগে। উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদের দেহে জমা থাকা এই

প্রায় দশ শতাংশ শক্তিই পরবর্তী ট্রফিক লেভেলের তৃণভোজী প্রাণীরা খাবার খাওয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে। আবার এই তৃণভোজী প্রাণীরা উদ্ভিদদের খাবার হিসেবে গ্রহণ করে যে শক্তি অর্জন করল তার প্রায় দশ শতাংশ সে তার নিজের দেহ গঠনে কাজে লাগায় বা দেহে জমা করে রাখতে পারে। তৃণভোজী প্রাণীদের দেহে জমা থাকা এই দশ শতাংশ (প্রায়) শক্তিই পরের ট্রফিক লেভেলে থাকা মাংসাশী প্রাণীরা খাবারের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে। তাহলে এর ফলে কী বোঝা গেল? প্রতিটা ট্রফিক লেভেলে মোট গৃহীত শক্তির প্রায় দশ শতাংশ দেহ গঠনের কাজে লাগে। আর কেবলমাত্র এই শক্তিটুকুই পরবর্তী ট্রফিক লেভেলে থাকা প্রাণীরা সংগ্রহ করতে পারে। এক ট্রফিক লেভেলে থেকে অন্য ট্রফিক লেভেলে স্থানান্তরণের সময় শক্তির কতটা অপচয় ঘটে— সেটা একজন বিজ্ঞানী রেমণ্ড লিন্ডেম্যান দেখিয়েছিলেন। তাঁর এই ব্যাখ্যাকে দশ শতাংশ সূত্র (Law of ten percent) বলা হয়।

লিন্ডেম্যানের দশ শতাংশের সূত্র (Law of ten percent)

প্রতিটি ট্রফিক লেভেলে গৃহীত শক্তির প্রায় দশ শতাংশ ওই পুষ্টিস্তরের জীবদের দেহ গঠনের কাজে লাগে যা পরবর্তী ট্রফিক লেভেলের জীবেরা গ্রহণ করতে পারে।

তোমাদের মনে এমন প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে বাকি প্রায় 90 শতাংশ শক্তি কোথায় গেল?

ভেবে লেখার চেষ্টা করো।

1. এক পুষ্টিস্তর থেকে পরবর্তী পুষ্টি স্তরে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময়, শক্তির একটা অংশ নানান শারীরবৃত্তীয় কাজে খরচ হয়। শক্তির এই অংশটুকু আর পরের পুষ্টিস্তরে পৌঁছোতে পারে না।
2. পুষ্টিস্তরের অন্তর্গত জীবরা মরে যায়। মরার পর পচা গলা মৃতদেহ মাটিতে মিশে গেলে পরবর্তী পুষ্টিস্তরের জীবরা ওই শক্তি ব্যবহার করতে পারে না।
3.
4.

পুকুরে, ঘাসজমিতে বা তোমার চেনা কোনো পরিবেশের কী ধরনের খাদ্যের পিরামিড হতে পারে তা একটি ছবি এঁকে দেখাও।

শক্তি সমস্যা

এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো জ্বালানি সমস্যা। জ্বালানী বলতে কয়লা আর পেট্রোলিয়াম, পৃথিবীতে এগুলো আর বেশি নেই, খুব তাড়াতাড়ি শক্তির এই দুই উৎস শেষ হয়ে যাবে। তাহলে উপায়?

এই উপায় খুঁজতেই গোটা দুনিয়া আজ ব্যস্ত।

শক্তির উৎস দুরকম।

(1) **অনবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস :** গোটা বিশ্বেই শক্তির এই উৎস খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। যেমন — কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস।

(2) **নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস :** বলা হয়, শক্তির এই উৎসগুলো কোনোদিন ফুরোবে না। আসলে তা নয়, সব উৎসেরই শেষ আছে। তবে এই উৎস থেকে শক্তি আমরা অনেক অনেক বেশি দিন ধরে পেতে পারি। যেমন - সৌর শক্তি, জোয়ার-ভাঁটার শক্তি, বায়ু শক্তি, জৈবগ্যাস শক্তি ইত্যাদি।

আজ তাই ভারতসহ বিশ্বের সমস্ত দেশ নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস নিয়ে গবেষণা করছে।

খাদ্যের রাসায়নিক শক্তি

রাসায়নিক পরিবর্তনে অণুর গঠন বদলে যায়। অণুর গঠন বদলানোর সময় কখনও কিছুটা শক্তি মুক্ত হয়, কখনও কিছুটা শক্তি বাইরে থেকে শোষিত হয়। খাদ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের সময় খাদ্যের নানা পদার্থের অণুর গঠনে অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং কিছুটা শক্তি উৎপন্ন হয়। একেই আমরা খাদ্যের রাসায়নিক শক্তি বলতে পারি। আমরা বহুক্ষেত্রে একেই খাদ্যস্থিত রাসায়নিক শক্তি বা খাদ্যের রাসায়নিক স্থিতিশক্তি বলে থাকি।

তোমরা জেনেছ যে, আমাদের প্রতিদিনের কাজের জন্য দরকারি শক্তি আমরা **খাবার** থেকে পাই।

এসো, এবার একটা তালিকা তৈরি করি।

তুমি প্রতিদিন যা যা খাবার খাও নীচে তা লেখো।

.....।

এখন তোমার লেখা উপরের তালিকা থেকে তুমি নীচের তালিকা পূরণ করো।

উদ্ভিদ থেকে পাওয়া খাদ্য	প্রাণীর দেহ থেকে পাওয়া খাদ্য

প্রাত্যহিক জীবনে ঘর্ষণ বল

হাতেকলমে

একটা ফুটবলকে বড়ো একটা মাঠে নিয়ে যাও। এবার বলটা মাঠের ওপর গড়িয়ে দাও।

কী দেখতে পেলে?

বলটার বেগ কি ক্রমশ কমতে লাগল?

শেষে কি বলটা থেমে গেল?

তাহলে কি বলটা চলার সময় প্রতি মুহূর্তে বাধা পাচ্ছিল?

কে এই বাধা দিল?

মাঠই (বল আর মাঠের তলের সংযোগস্থলে) বলের গতির ঠিক উলটোদিকে বাধা দিয়েছে। তাই ফুটবলের গতি কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত শূন্য হয়ে যায়। তাই বলটা থেমে যায়। এই বাধাকেই বলে ঘর্ষণ।

এরকম আরও কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করো। (নীচের টেবিলটা পূরণ করো।)

ঘটনা	কোন দুটি তলের মধ্যে ঘর্ষণ বল কাজ করছে	ঘর্ষণ বলের দিক
মেঝের উপর দিয়ে চাকাযুক্ত খেলনা গাড়িকে উত্তর থেকে দক্ষিণদিকে ঠেলে দাও।		
ইকবাল টেবিলের উপর রাখা বিজ্ঞান বইটা সুনন্দার দিকে ঠেলে দিল।		

হাতেকলমে

হাত ভেজা থাকলে ভালোভাবে শুকিয়ে নাও। এবার দু-হাতের তালু নমস্কারের ভঙ্গিতে জুড়ে ভালোভাবে ঘষো।

দু-হাতের তালুতে তুমি কি গরম অনুভব করছ?

এই উষ্ণতা এল কোত্থেকে?

তুমি একটা ধাতুর তৈরি চাবির রিং নাও। এবার মেঝের উপর রিংটা কিছুক্ষণ ঘষো।

এবার হাত দিয়ে রিংটা ধরো।

কী অনুভব করছ?

রিংটা গরম হলো কেন?

দেশলাই কাঠির বারুদের দিকটা দেশলাই বাক্সের গায়ে বারুদ অংশে ঘষলে দেশলাই কাঠি জ্বলে ওঠে কেন?

দেশলাই বাক্সের দু-পাশে বারুদের খরখরে প্রলেপ দেওয়া থাকে। ফলে দেশলাই কাঠির বারুদ ওই জায়গায় ঘষলে উষ্ণতা বেড়ে যায়। ফলে যে উষ্ণতায় বারুদ জ্বলে ওঠে, সেই উষ্ণতায় বারুদ পৌঁছে যায়। তাই আগুন জ্বলে ওঠে।

উপরের প্রতিক্ষেত্রেই যে তলদুটোর মধ্যে ঘর্ষণ হয়েছে, সেই তলদুটো গরম হয়ে গেছে। অর্থাৎ ঘর্ষণের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়।

ঘর্ষণের ফলে উষ্ণতা বাড়ে — এর আরও কয়েকটা উদাহরণ নিয়ে বলাবলি করো।

তোমার পেনসিলের দাগ মোছার ইরেজার অনেক দিন ব্যবহারের ফলে তার কী অবস্থা হয়?

ইরেজারের ভর, আয়তন সব কমে যায় কেন?

ইরেজার একটা নরম রাবার মাত্র। পেনসিলের দাগ মোছার সময় তুমি ইরেজারটা নিয়ে কী করো?

এর ফলে ইরেজারের কী ক্ষতি হয়?

অতএব সিদ্ধান্তে আসা যায় ঘর্ষণের ফলে বস্তুর ক্ষয় হয়।

এই কারনেই গাড়ির টায়ারের সঙ্গে রাস্তার ঘর্ষণের ফলে টায়ারের ক্ষয় হতে থাকে।

তুমি একটা রাবারের বল নিয়ে ঘাস আছে এমন মাঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে দাও।

এবার ফিতে দিয়ে মেপে দেখো বলটা কতদূর গড়াল।

এখন বলটাকে আন্দাজমতো সমান জোরে একটা মসৃণ সিমেন্টের মেঝের উপর গড়িয়ে দাও।

আবার ফিতে দিয়ে মেপে দেখো বলটা কতদূর গড়াল।

এবার ভেবে বলো মেঝের উপর দিয়ে বলটা বেশি গড়াতে পারল কেন?

তাহলে কি মাঠের উপর দিয়ে গড়াবার সময় বলটা ঘর্ষণজনিত বাধা বেশি পেয়েছে? কেন?

সমান সিমেন্টের মেঝের উপর দিয়ে গড়াবার সময় বলটা ঘর্ষণজনিত বাধা কম পেল কেন?

মাঠের তল আর মসৃণ মেঝের তলের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

কোন তলটা বেশি মসৃণ?

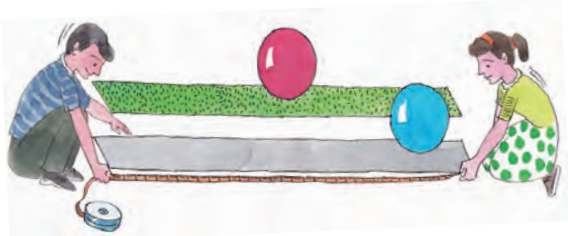

তবে কি মসৃণ তলে ঘর্ষণ কম হয়?

তাহলে, তলের প্রকৃতি (মসৃণ বা অমসৃণ) ঘর্ষণের উপর প্রভাব ফেলে। তলের মসৃণতা যত বেশি হয় ঘর্ষণ তত কম হয়।

যে-কোনো তলের উপরিভাগে অসংখ্য উঁচুনীচু বা এবড়োখেবড়ো

অংশ থাকে। ওই উঁচুনীচু কখনও এত কম যে, চোখে ধরা পড়ে না। ওই তলের উপর দিয়ে যখন কোনো বস্তু চলতে চায় তখন ওই উঁচুনীচু অংশগুলো চলন্ত বস্তুর স্পর্শতলের উঁচুনীচু অংশে বাধা পায়। এটাই ঘর্ষণ।

কোনো তলই সম্পূর্ণ মসৃণ নয়। খালি চোখে কোনো তলকে যতই মসৃণ বলে মনে হোক না কেন, ওই তলকে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, ওই তলের উপরিভাগে অসংখ্য উঁচুনীচু অংশ আছে। সুতরাং, ওই তলও সম্পূর্ণ মসৃণ নয়।

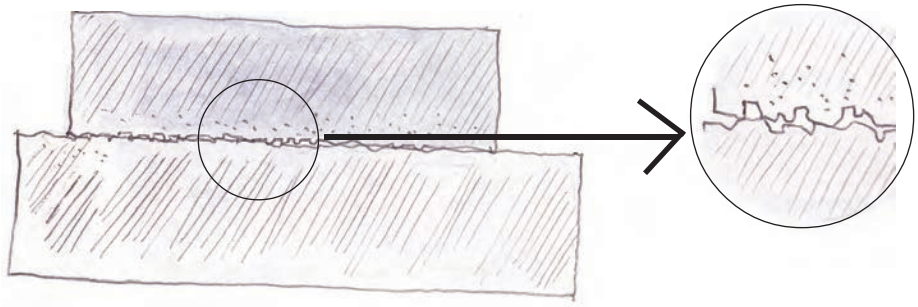

ঘর্ষণ বল যে দুই তলের মধ্যে ক্রিয়াশীল সেই তলদুটো প্রত্যেকে আলাদাভাবে একে অপরকে ঘর্ষণ বল প্রদান করে। অর্থাৎ প্রথম তল দ্বিতীয় তলকে ও দ্বিতীয় তল প্রথম তলকে ঘর্ষণ বল প্রদান করে।

নীচের ছবির মতো একটা কাঠের ব্লক নাও। এবার ওই ব্লকটা দেয়ালের গায়ে চেপে ধরো। এখন বন্ধুকে বলো ব্লকটাকে উপর থেকে নীচের দিকে ঠেলে সরাতে।

তোমার বন্ধু কি ব্লকটা সরাতে পারল?

এবার তুমি আরো জোরে ব্লকটাকে চেপে ধরো। বন্ধুকেও আগের চেয়ে জোরে ঠেলতে বলো।

কী দেখতে পেলে, বন্ধু কি সফল হতে পারল?

বন্ধু যদি সফল হয়ে থাকে, তবে আগের বারের চেয়ে এবারে বন্ধুকে কি বেশি বল প্রয়োগ করতে হয়েছে?

এই পরীক্ষাটিতে তুমি দেখলে যে, যদি কোনো বস্তুকে কোনো একটি তলের ওপর জোরে চেপে রাখা হয় তাহলে দুই তলের মধ্যে ঘর্ষণ বল বেশি হয়। টেবিলের উপর বই রেখে সেটিকে যদি টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করো, দেখবে যে যদি ওই বই -এর ওপর আরো কয়েকটা বই রাখা থাকে তবে তোমাকে অনেক জোরে ঠেলতে হবে। বাড়তি বই থাকলে বইও টেবিলের সংযোগস্থলে বেশি পরিমাণ বল প্রয়োগ করে এবং বইটা টেবিলের সঙ্গে বেশি জোরে চেপে যায়— ফলে ঘর্ষণ বল বেড়ে যায়।

7 তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের স্থিতি ও গতি

চাপের ধারণা

হাতেকলমে

এস কয়েকটা পরীক্ষা করা যাক :

উপকরণ : একটা গ্লাস, দু-টুকরো কাগজ, একটা রাবার ব্যান্ড ও পেছনটা ভোঁতা এমন একটা ডটপেন।

ছবির মতো করে, কাগজের টুকরোটাকে রাবার ব্যান্ড দিয়ে গ্লাসের মুখে ভালো করে আটকাও। গ্লাসের মুখে কাগজটা যেন টান টান থাকে।

এখন ছবির মতন করে প্রথমে পেনের পেছন দিক দিয়ে কাগজের টুকরোটাকে ফুটো করার চেষ্টাকর।

এবার দ্বিতীয় কাগজটা নিয়ে একইভাবে পরীক্ষাটা আবার করো। তবে এবার পেনের নিব অংশ দিয়ে কাগজটা ফুটো করার চেষ্টা করো।

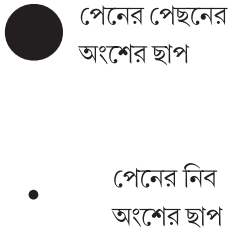

ভেবে বলো তো, একই জোরে বলপ্রয়োগ করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাগজ সহজে ফুটো হয়েছে কেন?

এখন পেনের পেছনটাতে একটু যে-কোনো রং বা কালি লাগাও। একটা সাদা কাগজে ওই অংশের ছাপ নাও। এবার সামনের নিব অংশ দিয়েও (আগের ছাপের পাশে) ছাপ নাও। (পাশের ছবির মতো)

দেখত, কোন ছাপটা চেহারায় বড়ো। যেটার চেহারা বড়ো তার ক্ষেত্রফলও বেশি।

তাহলে কি পেন ও কাগজের **স্পর্শতলের ক্ষেত্রফলের** সঙ্গে সহজে ফুটো হওয়ার কোনো সম্পর্ক আছে?

হাতেকলমে

একটা ভোঁতা মুখ ও আর একটা সুচালো মুখের পেরেক নাও। হাতুড়ি দিয়ে একইজোরে আঘাত করে দুটো পেরেককেই একটা কাঠের টুকরোর মধ্যে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করো।

কী দেখলে?

সরু মুখের পেরেকটা সহজেই কাঠে প্রবেশ করল। কিন্তু ভোঁতা মুখের পেরেক একইজোরে ঘা দেওয়া সত্ত্বেও, কাঠে প্রবেশই করল না। অথবা করলেও অতি সামান্য।

এবার দেখো তো কোন পেরেকের মুখের স্পর্শতলের ক্ষেত্রফল বেশি?

তাহলে দুটি পরীক্ষাই একই দিকে ইঙ্গিত করছে। **দু-ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, বল ঠিক ততটুকু জায়গায় প্রযুক্ত হচ্ছে, তার ক্ষেত্রফল বিভিন্ন হলে একই বল প্রয়োগ করা সত্ত্বেও বলের ফলাফল বিভিন্ন হয়।**

হাতেকলমে

একটা ইটকে দু-ভাবে (ছবিতে দেখো) একই উচ্চতা থেকে বালির ওপর ফেলা হলো। দু-ক্ষেত্রেই বালিতে তৈরি হওয়া গর্তের গভীরতা চোখের আন্দাজে তুলনা করো।

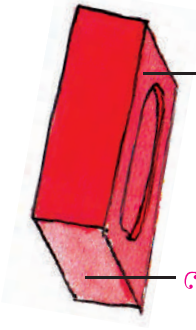

ক্ষেত্রফল (323 বর্গসেন্টিমিটার = 0.0323 বর্গমিটার)

ক্ষেত্রফল (97 বর্গ সেন্টিমিটার = 0.0097 বর্গমিটার)

একই ওজনের ইট একই উচ্চতা থেকে বালির ওপর পড়লে যেভাবেই পড়ুক, সমান বল (ধরা যাক প্রায় 25 নিউটন বল) প্রয়োগ করবে।

তুমি হিসেব করে দেখো, কোন ক্ষেত্রে $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$ এর মান বেশি ।

প্রথম ক্ষেত্রে , $\frac{25 \text{ নিউটন}}{0.0097 \text{ বর্গমিটার}} = 2577.32$ নিউটন / বর্গমিটার।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে , $\frac{25 \text{ নিউটন}}{0.0323 \text{ বর্গমিটার}} = 773.99$ নিউটন / বর্গমিটার।

এবার দেখো তো, যেক্ষেত্রে $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$ এর মান বেশি, সেই ক্ষেত্রেই কি বালিতে তৈরি হওয়া গর্ত বেশি গভীর?

এই $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$ -কেই চাপ বলা হয়। অর্থাৎ একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বলই হলো চাপ। অতএব, একই ক্ষেত্রফলের ওপর যদি বলের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে চাপের পরিমাণ বেশি হবে। আবার, একই পরিমাণ বল কম ক্ষেত্রফলের ওপর প্রযুক্ত হলে চাপের পরিমাণ বেশি হবে।

SI পদ্ধতিতে চাপের একক = $\frac{1 \text{ নিউটন}}{1 \text{ বর্গমিটার}}$

= 1 পাস্কাল বা 1 Pa

চাপের বড়ো একক হলো

1 কিলো পাস্কাল = 1000 পাস্কাল।

তাহলে জানা গেল, একই বল প্রযুক্ত হলে বলের প্রয়োগ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যত কমবে চাপও তত বাড়বে।

সুচ, পেরেক, স্ক্রু, ছুরি, কাটারি, বঁটি ইত্যাদি বস্তুতে এই নীতিকে কাজে লাগানো হয়েছে। এদের কার্যকরী অংশের ক্ষেত্রফল কমাতে সেই অংশ সরু অথবা ধারালো করা হয়েছে।

চাপের প্রভাব

হাতেকলমে

একটি এক লিটারের জলের বোতল নাও। বোতলের গায়ে বিভিন্ন উচ্চতায় তিনটে ফুটো করো। ফুটো তিনটি যেন একই সরলরেখায় না থাকে। এবার তাতে জল ভরতি করো। এবার ছবির মতো করে বোতলটিকে ধরে রাখ। দেখো তো কোন ফুটো দিয়ে জল বেশি জোরে বেরিয়ে আসছে ও বেশি দূরে যাচ্ছে?

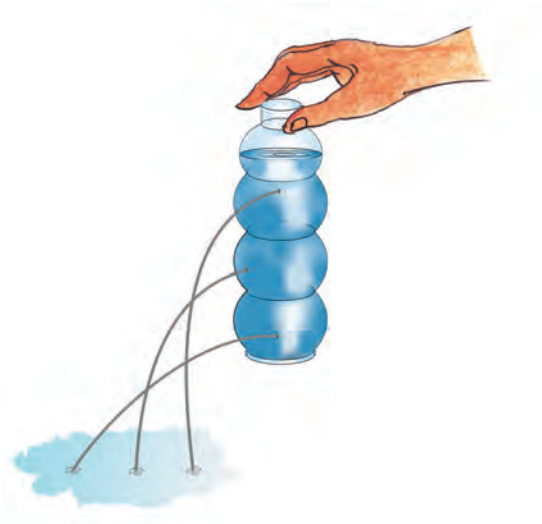

তাহলে, যেখানকার জল বেশি দূরে যাচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই জলের চাপ বেশি।

এবার বলো তো জলের গভীরতা বাড়লে চাপ বাড়ে না কমে?

এই কারণেই জলের চাপ কাটিয়ে সহজে চলার জন্য কোনো কোনো মাছ চ্যাপটা হয়।

এবার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে বলো— নদী বাঁধের তলদেশ চওড়া হয় কেন?

হাতেকলমে

একটি বড়ো 2 লিটারের জলের প্লাস্টিক বোতল নাও। বোতলটি জলে ভরতি করো। এবার একটি বড়ো ছড়ানো গামলা নাও। গামলাটিতে ওই জলের বোতলের প্রায় চার বোতল জল যাতে ধরে। বোতল ও গামলাটিকে মেঝের উপর রাখো। একটা প্লাস্টিক বা রাবারের নল দিয়ে পাত্র দুটো যুক্ত করো (ছবির মতো)। পাত্র দুটো এবং নলটির সংযোগস্থল দিয়ে যেন জল বাইরে বেরিয়ে না যায়। ছবি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, জল বেশি ধরলেও গামলায় জলের উচ্চতা বোতলের জলের উচ্চতার চেয়ে কম।

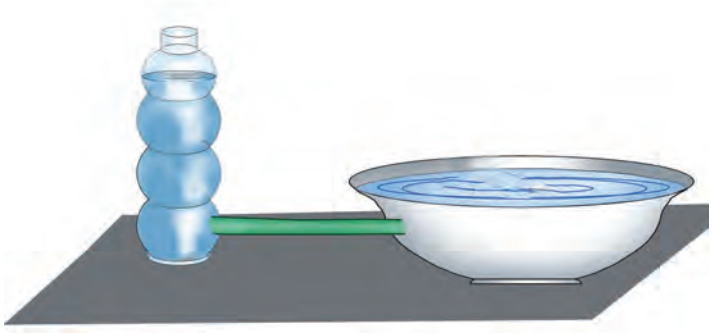

বলতে পারো, জল বোতল থেকে গামলার দিকে, না গামলা থেকে বোতলের দিকে প্রবাহিত হবে?

নিজে হাতে পরীক্ষাটি করলেই দেখতে পাবে যে বোতল থেকে জল গামলায় যাচ্ছে, যদিও গামলায় জলের পরিমাণ বেশি। এ থেকে বোঝা যায় যে তরলের প্রবাহ তরলের পরিমাণ দিয়ে ঠিক হয় না, তরলের উচ্চতা দিয়ে ঠিক হয়। বোতলের জলের পরিমাণ কম কিন্তু উচ্চতা বেশি। আর যেখানে উচ্চতা বেশি সেখানে গভীরতাও বেশি— তাই চাপও বেশি। বোতল থেকে গামলায় জল প্রবাহিত হয়েছে কারণ গামলায় জলের উচ্চতা বোতলের চেয়ে কম।

কোনো তরল বা গ্যাসের দুই স্থানে যদি চাপ অসমান হয় তবে, বেশি চাপের স্থান থেকে কম চাপের স্থানে তরল বা গ্যাস প্রবাহিত হয়।

হাতেকলমে

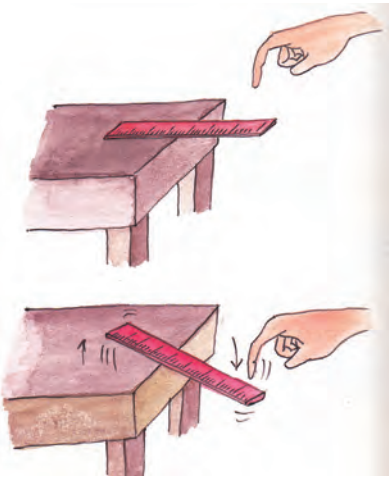

1) একটা টেবিলের ওপর কাঠ বা প্লাস্টিকের একটা বড়ো স্কেল রাখো। স্কেলটার কিছু অংশ টেবিলের বাইরে থাকবে। বেশিরভাগ অংশ টেবিলের ওপর থাকবে। ছবিতে দেখো।

এখন টেবিলের বাইরে থাকা অংশে স্কেলটার ওপর হঠাৎ করে চাপ দাও (সামান্য জোর দিলেই হবে)। কী দেখতে পেলে? স্কেলটা চট করে টেবিল থেকে উঠে গেল।

এবার, আবার স্কেলটা আগের মতো করে টেবিলের ওপর রাখো। এখন একটা বড়ো কাগজ (যেমন খবরের কাগজ), টেবিলের ওপর টান টান করে বিছিয়ে দাও ও তার ওপর হাত বুলিয়ে টেবিলের গায়ে চেপে দাও। খেয়াল রাখো যাতে টেবিলের ওপর রাখা স্কেলের পুরো অংশটা ঢেকে যায়।

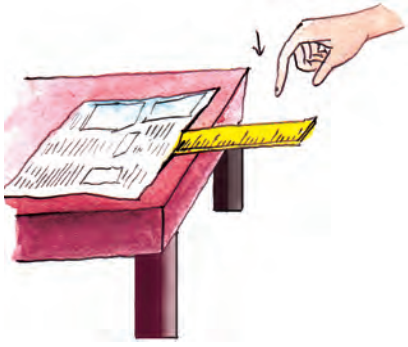

এবার, আবার স্কেলটার যে অংশ টেবিলের বাইরে আছে তার ওপর হঠাৎ করে চাপ দাও। এবার কি স্কেলটা চট করে উঠে আসতে পারল?

তাহলে কি স্কেলটাকে কেউ ওপর থেকে চাপ দিয়ে আটকে রেখেছিল?

স্কেলটার ওপরের হালকা কাগজটাই কি তাহলে স্কেলটাকে চাপ দিয়েছিল? যদি তাই হয়, তবে কাগজটাকে কে চেপে রেখেছিল? বায়ু ছাড়া তো কাগজের ওপর কিছু ছিল না।

তাহলে কি বায়ুই এই চাপ সৃষ্টির কারণ?

বড়ো ক্ষেত্রফলের ওপর চাপের প্রভাবে বেশি পরিমাণ বল ক্রিয়া করে এটা তোমরা জেনেছ (চাপ × ক্ষেত্রফল = বল)।

স্কেলের ওপর চাপা দেওয়া কাগজের ক্ষেত্রফল যেহেতু স্কেলের চাইতে বেশি, তাই কাগজের ওপর বায়ুর দেওয়া বল যথেষ্ট বেশি। বায়ুর চাপের ফলেই এই বলের সৃষ্টি হয়েছে।

2) বিছানার ওপর চাদরটা টান টান করে পাতা আছে। তুমি চাদরটাকে টান দিয়ে তুলে ফেলার চেষ্টা করো দেখি।

কী দেখতে পেলে?

পুরো চাদরটাই কি সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে এল?

চাদরের কিছুটা অংশ বিছানার সঙ্গে লেগে থাকতে চাইছে কেন?

তাহলে কি ওপর থেকে চাদরটার ওপর চাপ পড়ছে? চাদরের ওপরে তো বায়ু ছাড়া কিছু নেই।

আসলে, বায়ু ওপর থেকে নীচের দিকে চাদরটার ওপর চাপ দেওয়ার ফলেই ঘটনাটা ঘটেছে।

3) ট্রেনে বা বাসে ফেরিওয়ালার কাছে অথবা রকমারি জিনিসের দোকানে প্লাস্টিকের তৈরি এক ধরনের হুক পাওয়া যায় যার পেছনের অংশ রাবারের তৈরি। যেটা দেয়ালে বা কোনো মসৃণ তলে চেপে ধরলেই আটকে যায়। আঠা বা পেরেক ছাড়াই। তারপর সেখানে জামা বা হালকা কিছু ঝোলানো যায়। ছবিতে এরকম হুক দেখানো হয়েছে। ওইরকম দুটো হুক নিয়ে চলো একটা পরীক্ষা করা যাক। ছবির মতো করে হুক দুটোর পেছন দিক (রবারের অংশ) এক সঙ্গে স্পর্শ করে চাপ দাও।

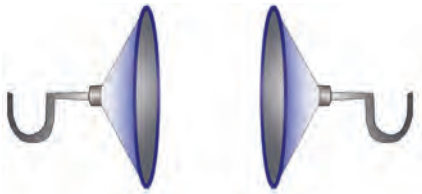

এবার দু-দিক থেকে আংটা দুটোকে জোরে টেনে খোলার চেষ্টা করো।

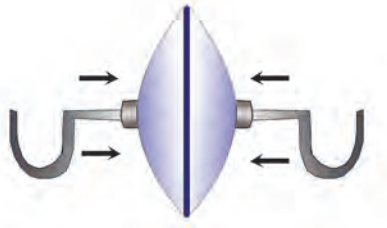

আংটা দুটো খুলছে না কেন?

এক্ষেত্রেও বায়ুর চাপের জন্যই ঘটনাটা ঘটেছে। হুক দুটোর পেছন দিক একসঙ্গে স্পর্শ করে চাপ দেওয়ার সময় রাবারের অংশ দুটো গায়ে গায়ে লেগে যায় ও তাদের ভেতরের বায়ু বেরিয়ে যায়। বাইরের বায়ু ওই রাবারের অংশ দুটির ওপর যে চাপ দেয় তাতে হুক দুটো জোরে আটকে যায়।

বন্ধু ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করো।

বারনৌলির নীতির ধারণা

1) একটা খাতার পৃষ্ঠা নাও। পৃষ্ঠাটির দু-পাশ সমান মাপে ভাঁজ করো (নীচের ছবি দেখো)। তৈরি হলো একটা ব্রিজ।

এখন ওই খেলনা ব্রিজটা টেবিলের ওপর রাখো (ছবিতে দেখো)।

এখন, ওই ব্রিজটার তলা দিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দিয়ে ব্রিজটাকে টেবিল থেকে ফেলে দাও দেখি। কিন্তু ব্রিজের দেয়ালে সরাসরি ফুঁ দেওয়া চলবে না।

কি , পারা গেল না তো। এবার চিন্তা করো, পারা গেল না কেন?

তাহলে, নিশ্চয়ই তোমার দেওয়া 'ফুঁ' ব্রিজের দেয়ালে তেমনকোনো বল প্রয়োগ করতে পারেনি।

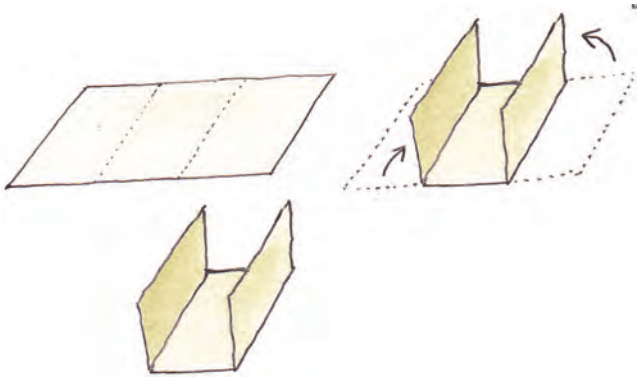

আসলে, কোনো গ্যাস বা তরল গতিশীল হলে যে স্থানে ওই তরল বা গ্যাসের বেগ বেশি সেই স্থানে ওই গ্যাস বা তরলের

চাপ কম হয়। — **বিজ্ঞানী বারনৌলি তাঁর নীতিতে এই কথাই বলেছেন**। তাই ফুঁ দেবার সময় ব্রিজের তলার অংশে চাপ কমে গেছে, এবং ব্রিজের ওপরে বায়ুর দেওয়া চাপ তখন তলার চাপের চাইতে বেশি। ফলে ব্রিজের ছাদ নীচের দিকে চেপে বসেছে ও ব্রিজটা পড়ে যায়নি।

2) তোমার খাতার পৃষ্ঠার মতো একটা কাগজ নাও। এবার পাশের ছবির মতো করে জোরে জোরে ফুঁ দাও। থামো। আবার ফুঁ দাও।

কী দেখতে পেলে? যতক্ষণ ফুঁ দিচ্ছিলে, ততক্ষণ কাগজটা সামনের দিকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে (চিত্র-ক)। কিন্তু যেই তুমি ফুঁ দেওয়া বন্ধ করছ, কাগজটা হাত থেকে নীচের দিকে ঝুলে যাচ্ছে। (চিত্র-খ)

(ক)

(খ)

এমনটা কেন হচ্ছে? তাহলে কি নীচ দিক থেকে ওপরের দিকে কাগজটার ওপর কোন বল প্রযুক্ত হচ্ছে?

আসলে, তোমরা আগের পরীক্ষা থেকে জেনেছ কোনো গতিশীল গ্যাস বা তরল, যে স্থানে বেশি বেগ নিয়ে চলে সেই স্থানে ওই গ্যাস বা তরলের চাপ কম হয়।

এই কারণে তুমি যখন কাগজের ওপর দিয়ে জোরে ফুঁ দিচ্ছিলে, তখন ওই স্থানে গতিশীল বায়ুর চাপ কমে গিয়েছিল। কাগজের নীচের বায়ুর চাপ তখন উপরের বায়ুর চাপের চাইতে বেশি। ফলে নীচের বায়ু কাগজের নীচ থেকে ওপরের দিকে যে বল প্রয়োগ করেছে তা কাগজের উপরের তলের উপর বায়ুর বলের চেয়ে বেশি। তাই কাগজ নীচে নামতে পারেনি।

3) খাতার পৃষ্ঠার মতো দুটো কাগজ ছবির মতো করে তোমার মুখের কাছে ধরো।

দুই কাগজের মাঝে সামান্য ফাঁক থাকবে।

এবার জোরে কাগজ দুটোর মধ্যে দিয়ে ফুঁ দিতে থাকো।

কী দেখতে পেলে?

জোরে ফুঁ দিলেই কাগজ দুটো জোড়া লেগে যাচ্ছে কেন? ফুঁ-এর ধাক্কায় তো তাদের দূরে সরে যাওয়ার কথা।

দুই কাগজের মধ্য দিয়ে ফুঁ-এর বায়ু যখন বেগে প্রবাহিত হচ্ছে তখন ওই জায়গায় বায়ুর চাপ কমে যাচ্ছে। ফলে কাগজের দুই পাশের বায়ু কাগজ দুটোর ওপর লম্বভাবে যে চাপ দেয় তা ভেতরে ফুঁ-এর জায়গার বায়ুর চাপের চেয়ে বেশি। তাই কাগজ দুটো জোড়া লেগে যায়।

8 মানুষের শরীর

হৃৎপিণ্ড

তোমরা পঞ্চম শ্রেণিতে তোমাদের বানানো যন্ত্র দিয়ে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনেছ। এবারে এসো দেখি, হৃৎপিণ্ডের শব্দটা ঠিক কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারি কিনা। জোগাড় করো: একটা প্লাস্টিকের ফানেল (ফাঁদি, কাপা বা কুপো), আর একটা পিচবোর্ড বা মোটা রাবারের নল, যা ওই ফানেলটার নলে লাগানো যাবে। ফানেলটার নলের সঙ্গে রাবারের নলটা আটকে দাও। তোমার বানানো এই ছোট্ট যন্ত্রটার মতো যন্ত্র কাকে ব্যবহার করতে দেখেছ, বলো তো?

এবার হৃৎপিণ্ডের শব্দ খুঁজে বার করো। কীভাবে টের পাবে হৃৎপিণ্ডটা কোথায় আছে? .....

- শিক্ষক/শিক্ষিকার উপস্থিতিতে প্রথমে তোমার ডান হাতের চেটো নিজের বুক আর বন্ধুর পিঠের ওপর রেখে দেখো তো, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটা কোথায় সবচেয়ে বেশি।
- তারপর ওই ছোট্ট যন্ত্রটা নাও। তোমার একটা কানে নলটা লাগাও। ফানেলটাকে বুকে আর পিঠে বিভিন্ন জায়গায় রেখে দেখত, কোথায় হৃৎপিণ্ডের শব্দটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যাচ্ছে।
- এবার হাতে আর নলে যা অনুভব করলে আর শুনলে, তা নীচের ছকে লেখো :

হৃৎপিণ্ডের অবস্থান সবচেয়ে ভালো বোঝা যাচ্ছে : (লেখো : ভালো, খুব ভালো, সবচেয়ে ভালো, খারাপ, একেবারে খারাপ, বোঝা যাচ্ছে না ইত্যাদি।)

অবস্থান	বুক	পেট
সামনে ডানে (উপর/নীচ)		
সামনে মাঝে (উপর/নীচ)		
সামনে বাঁয়ে (উপর/নীচ)		
পেছনে ডানে (উপর/নীচ)		
পেছনে মাঝে (উপর/নীচ)		
পেছনে বাঁয়ে (উপর/নীচ)		

বলো তো, হৃৎপিণ্ডটা ঠিক কোথায় আছে? .....।

— তুমি কী থেকে হৃৎপিণ্ডের অবস্থানটা বুঝতে পারলে? (একের বেশি জায়গায় টিক দিতে পারো)

— হৃৎপিণ্ডটা চোখে দেখা যায়/হৃৎপিণ্ডটা শব্দ করে/হৃৎপিণ্ডটা নড়াচড়া করে/হৃৎপিণ্ড থেকে শ্বাস বেরোয়।

তাহলে এসো দেখি, হৃৎপিণ্ডটা ঠিক কোন জায়গায় আছে।

তোমার নিজের বুকের মাঝখানে হাত দাও। কী অনুভব করেছ? .....।

বুকের মাঝখানে যে শক্ত হাড় বুঝতে পারছ তাই হলো বক্ষাস্থি (Sternum)।

তোমার নিজের পিঠের মাঝ বরাবর ঘাড়ের নীচ থেকে হাত নীচে নামাও। কী অনুভব করছ? .....।

পিঠের মাঝ বরাবর যে শক্ত হাড় বুঝতে পারছ তা হলো শিরদাঁড়া (Vertebral Column)।

হৃৎপিণ্ড থাকে মূলত বুকের মাঝখানে থাকা সেই বক্ষাস্থি ও শিরদাঁড়ার মাঝের অংশে।

এই হৃৎপিণ্ড অনেকটা দোতলা বাড়ির মতো দেখতে। যার ওপর তলায় দুটো ঘর বা কুঠুরি। আর নীচের তলায় দুটো ঘর বা কুঠুরি। প্রত্যেকটা ঘর একে অপরের থেকে আলাদা থাকে মেঝে বা দেয়াল দিয়ে।

টুকরো কথা

হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সারা দেহে যে নলগুলো দিয়ে যায় তার নাম হলো ধমনি। তেমনি সারা দেহ থেকে আবার যে নলগুলো দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে সেগুলোর নাম শিরা।

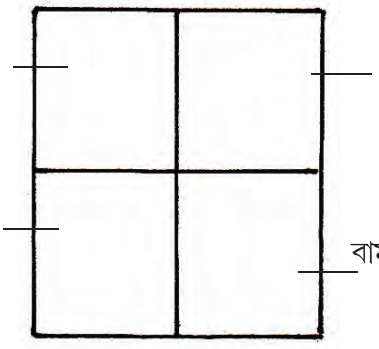

বামদিকের নীচের তলার ঘর

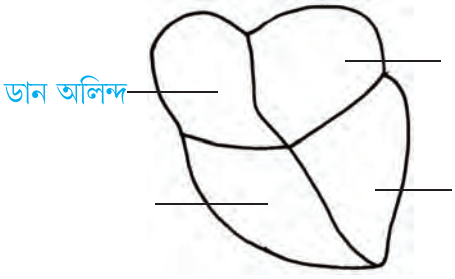

ওপরের ফাঁকা জায়গাগুলির কোনগুলি বাম ও কোনগুলি ডান তা তির চিহ্ন দিয়ে দেখাও। একই সঙ্গে তোমার হৃৎপিণ্ডেরও কোনটি বাম ও ডান দিক তাও ছবিতে তির চিহ্নের সাহায্যে দেখাও।

চলো-হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত কীভাবে চলাচল করে সেটাই ধাপে ধাপে দেখি—

সারা শরীর থেকে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা দিয়ে অবিশুদ্ধ রক্ত (বেশি CO_2 মেশানো রক্ত) পৌঁছোয় দোতলার ডানদিকের ঘর বা ডান অলিন্দে।

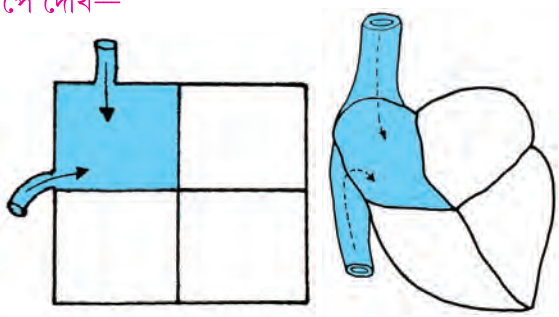

দোতলার ডানদিকের ঘর ডান অলিন্দ থেকে সেই CO_2 যুক্ত রক্ত দোতলার মেঝের একটা একমুখী দরজা বা ত্রিপত্র কপাটিকা দিয়ে এসে পড়ে একতলার ডান নিলয়ে।

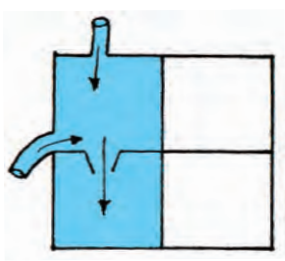

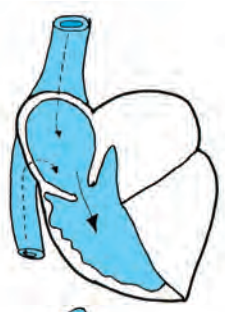

ডান নিলয় এবার সেই রক্তকে নিজে সংকুচিত হয়ে ফুসফুসীয় ধমনি দিয়ে পাঠিয়ে দেয় ফুসফুসে বিশুদ্ধ বা শোধন করার জন্য।

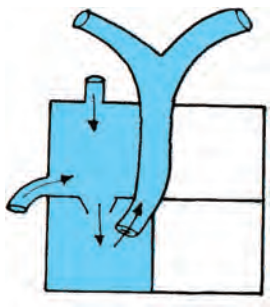

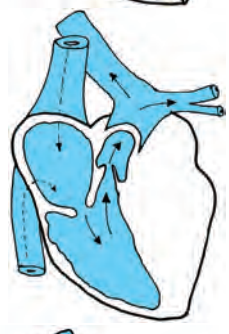

ফুসফুসে এই অবিশুদ্ধ রক্ত থেকে অনেকটা CO_2 বেরিয়ে যায়। আবার তেমনই ফুসফুস থেকে O_2 চলে এসে রক্তকে বিশুদ্ধ করে তোলে। বিশুদ্ধ রক্ত (যে রক্তে CO_2 কম, O_2 বেশি) আবার ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে পৌঁছোয় দোতলার বামদিকের ঘর বা বাম অলিন্দে।

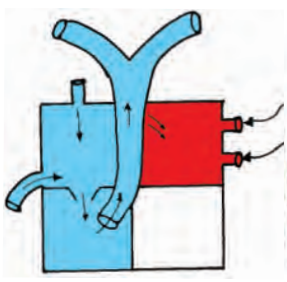

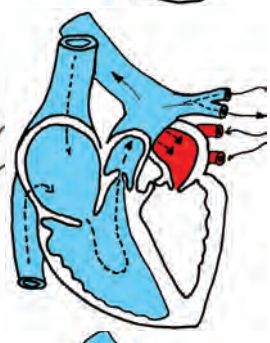

বাম অলিন্দ সংকুচিত হয়ে সেই রক্ত বাম অলিন্দের নীচে (দোতলার বামদিকের ঘরের মেঝে) থাকা দ্বিপত্রক কপাটিকা নামের একমুখী দরজা দিয়ে পৌঁছোয় একতলার বামদিকের ঘর বা বাম নিলয়ে।

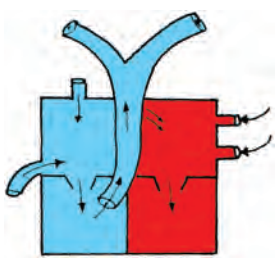

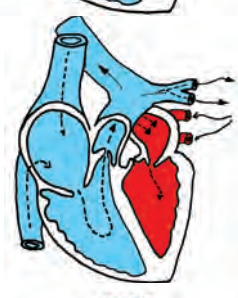

হৃৎপিণ্ডের এই বাম নিলয়টিই হলো সবথেকে বড়ো কুঠুরি। আবার নিজে সংকুচিত হয়ে পাম্প করার ক্ষমতা ধরলে সবথেকে শক্তিশালীও বটে। এবার একতলার বামদিকের ঘর, বাম নিলয় সংকুচিত হলে সেই বিশুদ্ধ রক্ত (O_2 বেশি, CO_2 কম) মহাধমনি দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে।

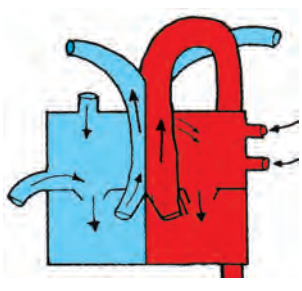

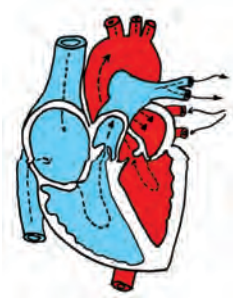

জেনে রাখো : ডান ও বাম অলিন্দে একই সঙ্গে রক্তে ঢোকে। আবার ডান ও বাম অলিন্দ থেকে একই সঙ্গে রক্ত ডান ও বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। ডান ও বাম নিলয় থেকে রক্ত একই সঙ্গে যথাক্রমে ফুসফুসীয় ধমনী ও মহাধমনীতে প্রবেশ করে। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য ছবিতে ধাপে ধাপে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কুঠুরিতে রক্তের প্রবেশ ও বের হওয়া দেখানো হয়েছে।

হৃৎপিণ্ডটা নড়াচড়া করে; একবার বড়ো হয় (প্রসারিত হয়) আবার তার পর ছোটো হয় (সংকুচিত হয়)। একবার প্রসারণ, আর একবার সংকোচনকে একসঙ্গে হৃৎস্পন্দন বলে।

বুকে হাত দিয়ে গোনার চেষ্টা করত, মিনিটে কতবার তোমার হৃৎস্পন্দন হচ্ছে? ভালোভাবে পারছ না? নাড়ি গুনে বলো। বন্ধুদের নাড়িও গুনে দেখো।

(1) তোমার হৃৎস্পন্দন মিনিটে 72-80 বার।

(2) ..... এর হৃৎস্পন্দন মিনিটে ..... বার।

নাড়ি পাচ্ছ না? খুব সহজ। খুঁজে দেখি এসো।

বাম হাত চিত করে রাখো। কবজিতে বুড়ো আঙুলের নীচ বরাবর মোটা হাড়টার ঠিক ভেতরের দিকে ডান হাতের তর্জনী এবং মধ্যমা রাখো। অনুভব করার চেষ্টা করো।

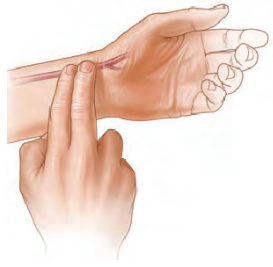

কী টের পাচ্ছ? .....

কী নড়াচড়া করছে? .....

এটাই হলো নাড়ি (Pulse)।

নাড়ি কী, কেন হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে তার যোগ, পরে জানবে। তোমার হৃৎস্পন্দন বা নাড়ির গতি মিনিটে কতবার তা শোনার চেষ্টা করো। বন্ধুদেরও নাড়ির গতি মাপার চেষ্টা করো। এভাবে পাঁচ-ছয়জনের দেখো। প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দন মোটামুটি কত থেকে কত বার হচ্ছে?

(1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) ..... (5) ..... (6) .....

এবার এসো, নীচের কর্মপত্রগুলি পূরণ করি।

প্রথম কর্মপত্র: নাড়ির অবস্থান ও প্রকৃতি

দেহের আর কোথায় কোথায় নাড়ি পেলে (জায়গাগুলোর নাম লেখো)	নাড়ির স্পন্দন কী হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে চলছে?	কারণ কী?
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

কোন নাড়িটা সবচেয়ে স্পষ্ট? .....। এর কারণ কী? .....।

তোমার বন্ধুর বিশ্রামের সময় নাড়ির গতি মাপো। এবার তাকে একটা বেঞ্চের ওপর ওঠানামা করতে বলো। প্রত্যেক এক মিনিট বাদে বাদে তার নাড়ির গতি মাপো। পাঁচ মিনিট বাদে তাকে বিশ্রাম করতে দিয়ে আবার প্রতি মিনিটে তার নাড়ির গতি মাপো।

দ্বিতীয় কর্মপত্র: কাজের সময়ে নাড়ির গতি

বিশ্রামকালে নাড়ির গতি/মিনিট	
এক মিনিট কাজ করার পরে নাড়ির গতি/মিনিট	
দুই মিনিট কাজ করার পরে নাড়ির গতি/মিনিট	
তিন মিনিট কাজ করার পরে নাড়ির গতি/মিনিট	
চার মিনিট কাজ করার পরে নাড়ির গতি/মিনিট	
পাঁচ মিনিট কাজ করার পরে নাড়ির গতি/মিনিট	
এর কারণ কী?	
কাজ শেষ হবার পরে প্রথম মিনিটে নাড়ির গতি/মিনিট	
কাজ শেষ হবার পরে দ্বিতীয় মিনিটে নাড়ির গতি/মিনিট	
কাজ শেষ হবার পরে তৃতীয় মিনিটে নাড়ির গতি/মিনিট	
কাজ শেষ হবার পরে চতুর্থ মিনিটে নাড়ির গতি/মিনিট	
কাজ শেষ হবার পরে পঞ্চম মিনিটে নাড়ির গতি/মিনিট	
এর কারণ কী?	
কতক্ষণে নাড়ির গতি স্বাভাবিক হলো?	

তোমার বন্ধুটির শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডের কোনো রোগ অথবা অন্য কোনো শারীরিক দুর্বলতা থাকলে, তাকে দিয়ে এই কাজ করিও না।

হৃৎপিণ্ডের সমস্যা

1. রবীনের ছোটো বোন রীনা খুব কমজোরী। খেলতে গেলেই হাঁপিয়ে যায়। তাই ও চুপ করে বসে থাকতে ভালোবাসে। ওর মা বলেছে রীনার নাকি হৃৎপিণ্ডে একটা ফুটো আছে। ডাক্তারবাবু জানিয়েছেন সেটা অপারেশন করতে হবে।

2. রহিমের দাদু নাকি দু-তিনবার মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে ডাক্তার বলেছেন ওনার নাকি হৃদযন্ত্রের সঙ্কোচন মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। পেসমেকার বসানো দরকার। না হলে হৃৎস্পন্দন কখনো-কখনো বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

3. নিমাই মুর্মুর বাবার গতমাসে বুকে খুব ব্যথা হয়েছিল, খুব ঘামও নাকি হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে ওনারা বলেছিলেন হৃদযন্ত্রের দেয়ালের পেশিগুলোতে রক্ত চলাচল কমে গেছে। তাই ওগুলো ভালো করে কাজ করতে পারছে না। হাসপাতালে ভরতি করে রাখতে হবে। ওষুধে কাজ না হলে হৃদযন্ত্রের পেশিতে রক্ত চলাচল ঠিক করতে গেলে অপারেশন করতে হতে পারে।

ওপরের সমস্যাগুলো জানলে। এগুলো হলে হৃদযন্ত্রের কাজ স্বাভাবিক হয় না — এধরনের সমস্যাগুলোকেই বলে হৃদযন্ত্রের অসুখ।

শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে ওপরের অসুখগুলো কী কী কারণে হতে পারে তা জানার চেষ্টা করো।

রক্ত

বাড়িতে দেখেছ কি, যখন চা বা কফি বানানো হয় তখন জলের ভেতর কফির গুঁড়ো, দুধের গুঁড়ো, চিনি — এসব কত কিছু মেশানো হয়? এইসব মেশানোর ফলে চা-এর রং, গন্ধ, স্বাদ জলের থেকে অন্যরকম হয়।

আমাদের শরীরে রক্তও সেইরকম। রক্তে বেশির ভাগটাই জল থাকলেও অনেক রকমের জিনিস মেশানো আছে এতে। লালরঙের একরকম ছোটো ছোটো কণা যা খালি চোখে দেখা যায় না (যেমন — চা, কফির কণাও জলে মিশে যাবার পর খালি চোখে আলাদা করা যায় না)। তেমনই রক্তে সাদা সাদা খুব ছোটো ছোটো কণা থাকে তাদেরও আলাদা করে খালি চোখে দেখা যায় না (চা-এ দুধের গুঁড়ো মেশানোর পর দুধকে আর আলাদা করে বোঝা যায় কি?)।

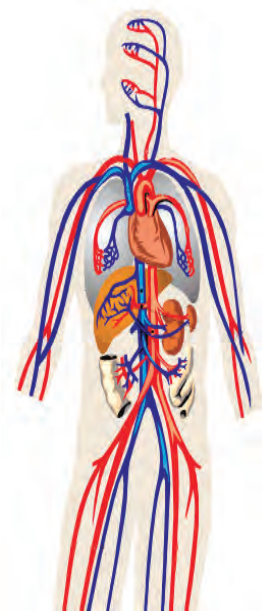

রক্তের ওই নানারকমের মিশে থাকা অংশগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক —

1. জলীয় অংশ

রক্তের বেশির ভাগটাই হলো জলীয়। তাকে বলে রক্তরস বা প্লাজমা। এই অংশ না থাকলে রক্ত মোটেই শরীরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মোটা-সরু নানারকম নালী দিয়ে চলাচল করতে পারত না। তার ফলে অনেকগুলো কাজ। যেমন — খাবার হজম হবার পর তৈরি হওয়া ছোটো আকারের কণাগুলো খাদ্যনালী থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া, শরীরের নানা জায়গা থেকে তৈরি হওয়া অদরকারি যৌগগুলো (যেমন — CO_2, শরীরে তৈরি হওয়া ক্ষতিকারক যৌগ) বয়ে নিয়ে ফুসফুস, বৃক্ক এসব জায়গায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

রক্তের জলীয় অংশের মধ্যে একরকম উপাদান থাকে যা জীবাণুর দেহ থেকে বেরোনো নানা রোগসৃষ্টিকারী পদার্থকে ধ্বংস করে।

2. লাল রঙের, চোখে দেখা যায় না, এমন কণার নাম হলো লোহিত রক্তকণিকা। এরা প্রধানত ফুসফুসের কাছ থেকে অক্সিজেনকে হাত ধরে নিয়ে পৌঁছে দেয় শরীরের আনাচেকানাচে প্রায় সব জায়গায়।

3. সাদা, খুব ছোটো কণার মতো যারা, চোখে দেখা যায় না — এদের নাম শ্বেত রক্তকণিকা। এদের সাদা রংটা রক্তে মিশে থাকা লোহিত রক্ত কণিকার লাল রঙের জন্য আলাদা করে বোঝা যায় না। তবে এদের কাজ খুব দরকারি। মূলত এরা শরীরের রক্ষীর কাজ করে। পাহারাদার বা সৈন্যের মতোই এদের কাজ হলো বাইরে থেকে আসা শত্রু যেমন রোগের জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে শরীরকে রক্ষা করা। আবার শরীরে কোথাও ক্ষত হলে তা সারাই করার সময়ও এদের দরকার হয়।

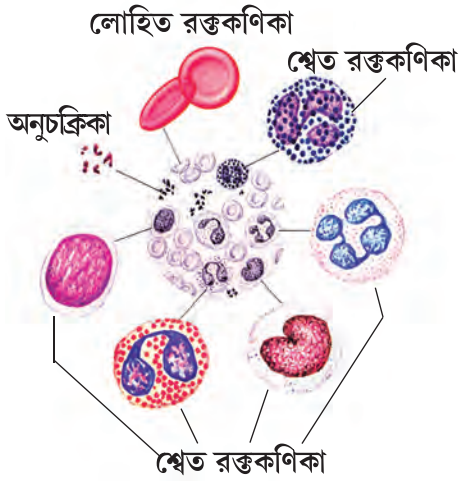

টুকরো কথা

তবে অনেক সময় কিছু কিছু মারাত্মক জীবাণু আছে যেমন টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া এসব — শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা এদের সঙ্গে লড়াইতে এঁটে ওঠে না। টিকা (Vaccine) দিয়ে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আগে থেকেই উজ্জীবিত ও সক্রিয় করে তোলা হয় যাতে শরীরে ঐ সব রোগের জীবাণু ঢুকলে শরীর তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।

4. রক্তে আর একরকমের খুব ছোটো ছোটো কণা থাকে। যাদের বলে অণুচক্রিকা। এরা শরীরের কোথাও কেটে গেলে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

5. রক্তে অনেক কিছুই থাকতে পারে — চায়ে চিনি বাইরে থেকে মেশানো হয়, কিন্তু রক্তের মধ্যেই মেশানো থাকে চিনি, নুন এমন কত কী। সেসব উপাদানের মাত্রাও ঠিকঠাক থাকা দরকার ।

   রক্তের এই উপাদানগুলো এদিক ওদিক হলেই মুশকিল — শরীরের স্বাভাবিক কাজে ঘটবে বিঘ্ন। যেতে হতে পারে চিকিৎসকের কাছে।

আচ্ছা, রোজ তো নানা জীবাণু তোমার দেহে ঢুকে পড়ে, কিন্তু রোজ রোজ তো তোমার রোগ হয় না। তাহলে তোমার দেহের ভেতরে ওইসব জীবাণুদের মেরে ফেলে কে? এসো দেখি।

বলো তো, নীচের জিনিসগুলো সম্পর্কে তুমি কী জানো? নীচের ছকে লেখো:

	কোথায় দেখতে পাও	কখন দেখতে পাও
1. পিচুটি		
2. পুঁজ		
3. শ্লেষ্মা/কফ		

এগুলো তৈরি হবার দরকার কী? দেখো তো বুঝতে পারো কিনা? নীচের কতগুলি ঘটনা দেওয়া আছে, সেখান থেকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করো আর নীচে লেখো।

পিচুটি	→	.....	→	.....	→	.....
পুঁজ	→	.....	→	.....	→	.....
শ্লেষ্মা বা কফ	→	.....	→	.....	→	.....

● নাকের ভেতরে জীবাণু ঢোকে।	● চোখের জলের মধ্যে থাকা জীবাণুনাশক জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলে।	● মরা জীবাণুগুলো পিণ্ডাকারে চোখের কোনায় জমে।
● চোখের পাতলা চামড়ার মধ্য দিয়ে জীবাণু ঢোকে।	● রক্তের মধ্যে থাকা জীবাণুনাশক শ্বেত রক্তকণিকা জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলে।	● সাদা তরলের মতো চামড়া থেকে বেরিয়ে আসে।
● ফোঁড়া বা কাটা জায়গার মধ্যে দিয়ে জীবাণু ঢোকে।	● শ্লেষ্মা তৈরি হয়।	● জীবাণুগুলোকে জমাট করে আটকে ফেলে।

তাহলে বুঝতেই পারছ, যে জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলবার জন্য রক্ত ছাড়াও আমাদের দেহে নানারকমের ব্যবস্থা আছে। চোখ, নাক বা চামড়ার কাটা অংশ দিয়ে জীবাণুরা ঢোকার চেষ্টা করলে রক্তের মতো ওখানেও জীবাণুদের মেরে ফেলার ব্যবস্থা আছে।

জল বা খাবারে মিশে থাকা জীবাণুগুলোকে মারবার কী কী ব্যবস্থা তুমি জানো?

* এই জীবাণুরা কোন পথে যেতে পারে পরপর সাজিয়ে লেখো তো : [গ্রাসনালী, পাকস্থলী, মুখগহ্বর]

  1. ..... 2. ..... 3. .....

* কোথায় কোথায় খাবারগুলো কম সময় থাকে?

  1. ..... 2. .....

* ওইসব জায়গায় জীবাণু মারার জন্য কী কী থাকতে পারে জানো?

  1. লালায় লাইসোজাইম (জীবাণু ধ্বংসকারী রাসায়নিক পদার্থ) 2. পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

পরিচয় লেখো : এসো তাহলে ভালো করে বুঝে নিই। আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ বা অন্যান্য ব্যবস্থাটা কীভাবে তৈরি, আর কীভাবেই বা তা কাজ করে। নীচের ছকে লেখো :

রক্তের কোন কোন অংশ জীবাণু মেরে ফেলে : (a) .....।
(b) .....।

কী করা উচিত বলো : আমাদের দেহে রোগ জীবাণুর সংক্রমণ কমাতে তাহলে কী কী করা দরকার?

1. পরিচ্ছন্নতা : .....।
2. আচরণ : .....।
3. বাইরে থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা .....।

কী খাওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো :

রোগ প্রতিরোধকারী সকল উপাদানই মূলত প্রোটিন দিয়ে তৈরি। তাহলে দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা বজায় রাখতে কী কী খাওয়া দরকার :

1. ..... 2. ..... 3. .....

4. ..... 5. ..... 6. .....

ফুসফুস

মনে আছে কি?

আমাদের পৃথিবীতে যে বাতাস থাকে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হলো অক্সিজেন যাকে আমরা প্রাণবায়ুও বলে থাকি।

এই অক্সিজেন আমাদের মতোই সব প্রাণীদেরই দরকার খাবার থেকে শক্তি তৈরির জন্য, না হলে আমরা বেঁচেই থাকতাম না।

তাহলে বলো তো — বাতাস থেকে এই অক্সিজেন আমাদের শরীরের ভেতর নিয়ে যায় কে?

খেয়াল করেছ কি?

এক গ্লাস শরবতে একটা নল ঢুকিয়ে ফুঁ দিলে হাওয়ার বুদবুদ বের হয়, আবার সেই নল দিয়ে শরবত বা দুধ চোঁ চোঁ করে শুষে নেওয়া যায়। গ্লাসের শরবত বা দুধ শেষ হবার সময় তখন কি টেনে নেওয়া হয়? বাতাস, তাই না?

তাই নিশ্চয়ই বুঝলে — বাতাসের সঙ্গে অক্সিজেন আমাদের শরীরে ঢোকার রাস্তাটা শুরু হয় নাক বা খোলা মুখ দিয়ে।

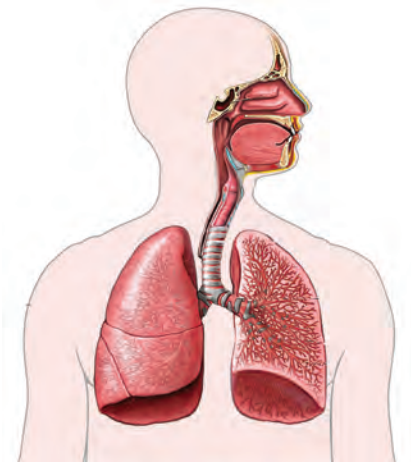

সেখান থেকে কোথায় যায়?

নাকের বা মুখের ভেতর দিয়ে বাতাস প্রথমে পৌঁছোয় গলার ভেতর দিকে — সেখান থেকে শ্বাসনালী দু-ভাগ হয়ে যায়। যাদের বলে ক্লোমশাখা (bronchus)। এরা পৌঁছোয় বুকের ভেতর থাকা দু-দিকে দুটো বড়ো হাওয়ার ব্যাগের মতো জায়গায়। ওরাই হলো ফুসফুস।

ফুসফুসের রং কেমন?

কালচে গোলাপি, কারণ অনেক সরু সরু নালী দিয়ে এর ভেতর রক্ত চলাচল করে। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে বাতাস থেকে ধুলো ময়লা ঢুকে ক্রমশই কালো কালো ছোপ পড়ে যায়।

ফুসফুসের ভেতরটা কেমন?

শ্বাসনালী যতই ভেতরে ঢোকে তা গাছের ডালপালার মতো অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় ভাগ হতে থাকে। সবশেষের সূক্ষ্ম শ্বাসনালিকা (bronchiole); তারও শেষে থাকে দশ কোটি ছোটো ছোটো বেলুনের মতো বায়ুথলি। শ্বাসনালীর শাখাপ্রশাখা যেখানে শুরু হচ্ছে সেখান থেকে এই ছোটো ছোটো বায়ুথলি পর্যন্ত বুকের দু-দিকে থাকা দুটো যন্ত্রের নামই ফুসফুস। এক-একটা ফুসফুসে প্রায় দশ কোটি বায়ুথলি থাকে। বায়ুথলির গায়ে রক্তনালী থাকে। বাম ফুসফুসে দুটো খণ্ড আর ডান ফুসফুসে তিনটি খণ্ড আছে।

তাহলে বলো তো ফুসফুস কী কাজ করে?

এককথায় বলা যায় বাইরে থেকে বাতাস শরীরের ভেতর টেনে নেওয়া; সেই টেনে নেওয়া বাতাস থেকে অক্সিজেনকে রক্তে পৌঁছে দেওয়া; আর শরীরে তৈরি হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্ত থেকে টেনে নিয়ে বাতাসের সঙ্গে শরীর থেকে বের করে দেওয়া।

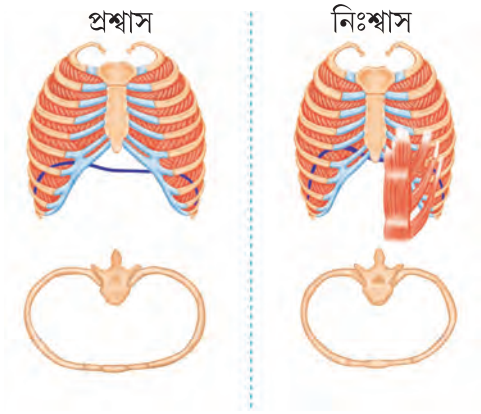

আমরা শ্বাস নিই, আর শ্বাস ফেলি কীভাবে? আমাদের পাঁজরের ফাঁকে যে পেশিগুলো আছে, তাকে বলে পঞ্জর পেশি (Intercostal muscle)। বুক আর পেটের মাঝখানে ভেতরে আছে একটা পেশি। এর নাম হলো মধ্যচ্ছদা (Diaphragm)। এগুলির সাহায্যে একবার আমাদের বুকের খাঁচা ফুলিয়ে তোলা হয়, তখন বাতাস ভেতরে ঢোকে। একে বলে প্রশ্বাস। আবার এই পেশিগুলো ঢিলে হয়ে গেলে বুকের খাঁচা চুপসে যায়, আর বাতাস ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়। একে বলে নিশ্বাস।

ফুসফুসের সমস্যা

1. শিলাদিত্যর দাদু ভোরবেলা খুব কাশতে থাকেন। দম নিতে খুব কষ্ট হয় ওনার।
2. মাঝে মাঝেই বিশেষ করে শীতকালে রহিমচাচার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কাছে গেলে সাঁই সাঁই শব্দ শোনা যায়। তখন উনি জোরে জোরে চলাফেরা করতে পারেন না।
3. শ্যামলের কাকার কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে মাঝে মাঝেই। রাতের দিকে জ্বর আসে। শরীরের ওজন কমে আসছে।
4. পিয়ালীর বোনের ছোটোবেলা থেকেই খুব কাশি হয়। নাকের পাটা দুটো ফুলে ফুলে ওঠে শ্বাস নেবার সময়। মাঝে মাঝে নাক বন্ধও হয়ে যায়।

ওপরের সমস্ত ঘটনাগুলোই হলো ফুসফুসের নানান সমস্যা।

অস্থি, অস্থিসন্ধি ও পেশি

অস্থি

নীচের বাঁদিকের উপাদানগুলোর সঙ্গে ডানদিকের কাজগুলি লাইন টেনে মেলাও তো দেখি ।

(1)	সার্কাসের তাঁবু	(i)	কাঠামো হিসেবে ধরে রাখা
(2)	পাখির খাঁচা	(ii)	টান বা ঠেলা মেরে সরানো
(3)	ময়লা সরাবার কাঁটা	(iii)	চারপাশে ঢাকা দিয়ে রক্ষা করা

আচ্ছা, আমাদের দেহের কোন অংশটার সঙ্গে এইরকম কাজের মিল আছে? নীচের তালিকা থেকে বেছে লেখো তো।

(1) .....।

(2) .....।

(3) .....।

[বুকের পাঁজর, উরুর হাড়, বাহুর হাড়, কাঁধের হাড়, খুলির হাড়, কোমরের হাড়, শিরদাঁড়া]

এই কাজগুলি তাহলে আমাদের দেহের কোন অংশটি করে? .....।

অস্থি মানবদেহের যে শুধু কাঠামো তৈরি করে তা নয়, অন্যান্য কাজও করে—

(i) ফুসফুস, ..., ... প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে রক্ষা করে।

(ii) দেহকে নির্দিষ্ট ..... প্রদান করে।

তাহলে হাড় বা অস্থি আমাদের দেহে গুরুত্বপূর্ণ কেন? .....।

মানবদেহের মতো সমস্ত প্রাণীদের দেহ কি কঙ্কালযুক্ত? .....।

কয়েকটি প্রাণীকে চিহ্নিত করো যাদের দেহে হাড় বা অস্থি নেই :

1. ....., 3. .....,

2. ....., 4. .....,

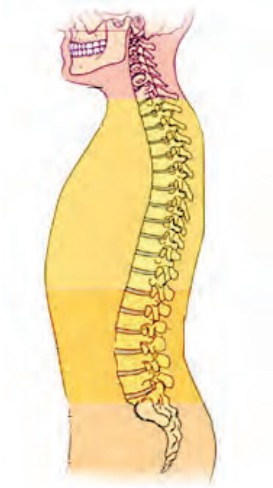

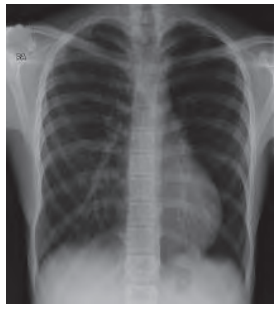

তুমি কি শনাক্ত করতে পারো আগের পাতার এক্সরে প্লেটের ছবিগুলি মানবদেহের কঙ্কালের কোন কোন অংশ?

(1) ..... (3) .....

(2) ..... (4) .....

এসো তোমার আর তোমার বন্ধুর দেহের হাড়গুলো ছুঁয়ে দেখি :

তোমার বন্ধুর হাড়গুলো হাতের কোথায় আছে, আর কেমন দেখতে, হাত দিয়ে অনুভব করে দেখো তো। প্রয়োজনে ছকের নীচে দেওয়া ছবিগুলোর সাহায্য নাও। তারপর নীচের ছকে লেখো:

কোন জায়গায়	কটা হাড়	হাড়ের আকৃতি কেমন	কী কাজ করে বলে মনে হয়
ওপর হাত (বাহু)			
নীচ হাত (পুরোবাহু)			
কবজি			
হাতের তালু			
হাতের আঙুল			

[হাড়ের আকৃতি বোঝাতে এই শব্দগুলো লিখতে পারো— লম্বা, ছোটো, সরু, মোটা, চ্যাপটা, ধারগুলো মোটা, নলের মতো, তেকোণা, সোজা, বাঁকা]

ওপর হাত (বাহু)

নীচ হাত (পুরো বাহু)

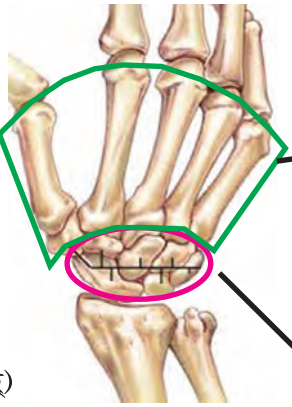

হাতের তালু

হাতের আঙুল

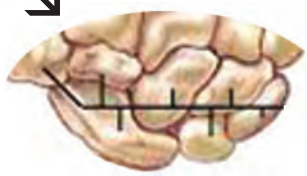

কবজি

আচ্ছা, এবার নীচে দেওয়া কঙ্কালের সঙ্গে তোমার শরীর মেলাও তো।

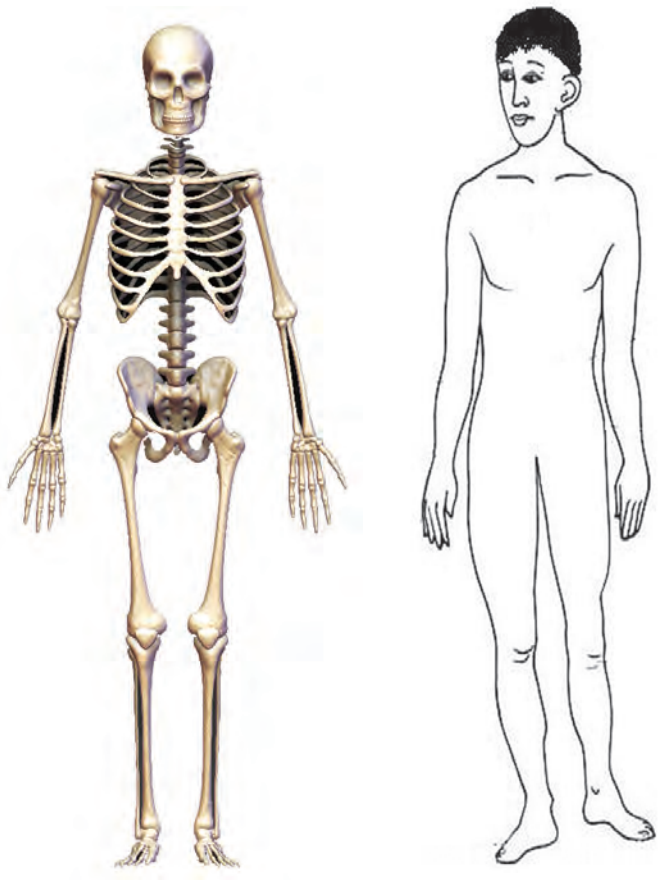

কোন হাড়গুলো দেহের ঠিক মাঝখানে (কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর) আছে বলো।

1.

2.বক্ষপিঞ্জর (স্টারনাম ও রিবস)

3.

— এরা হলো অক্ষীয় কঙ্কাল । (Axial Skeleton)

কোন হাড়গুলো পাশে ঝোলে বলো।

1.পেক্টোরাল গার্ডল

2.

3.

4.

— এরা হলো উপাঙ্গীয় কঙ্কাল। (Appendicular Skeleton)

হাড়ের সমস্যা

1. সুমন মাথায় হেলমেট না পরেই ব্যাট করছিল। বোলার রবার্টের দ্রুতগতির বাউন্সার দেওয়া বল এসে আঘাত করল সুমনের মাথার খুলিতে। সুমন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

2. আলম খেলছিল ফুটবল। হঠাৎ পড়ে গিয়ে হাতের কবজিতে লাগল আঘাত। কবজির ওপর প্রচণ্ড ব্যথা হতে লাগল। হাত নাড়ানোই মুশকিল। ধীরে ধীরে জায়গাটা ফুলে উঠতে লাগল। বিকাশকাকু খেলা দেখছিল। এসে বললেন তাড়াতাড়ি পিন্টুদার দোকান থেকে বরফ নিয়ে আয়।

3. তনুজার মা সেদিন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলেন। প্রচণ্ড চোট পেলেন মেরুদণ্ডে। তারপর আস্তে আস্তে ওনার পা-গুলো অবশ হয়ে এল। এখন পায়ের নড়াচড়া সম্পূর্ণ বন্ধ। হুইলচেয়ারে বসে চলাফেরা করতে হয়।

4. রোশনের দিদিমার বয়স সত্তর। সেদিন বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গেলেন, আর উঠতে পারলেন না। ডান দিকের পায়ের হাঁটুর নীচের হাড় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। সঙ্গে কোমরে অসহ্য ব্যথা। পাড়ার লোকেরা ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

ওপরের আলোচনা করা ঘটনাগুলো হলো হাড়ের নানা ধরনের চোট-আঘাতজনিত সমস্যা।

অস্থিসন্ধি

ওপরের ছবিগুলি দেখে লেখো তো দেহের কোন গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য এই কাজগুলি সম্ভব?
.....।

জন্মের সময় একজন শিশুর প্রায় 300টি হাড় বা অস্থির অংশ থাকলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলোই একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে অবশেষে পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে থাকে 206টি।

এই অস্থিগুলো একে অন্যের সঙ্গে অস্থিসন্ধিতে লিগামেন্ট নামের সুতো বা দড়ির মতো জিনিস দিয়ে বাঁধা থাকে; ফলে সবমিলিয়ে একটা কাঠামো তৈরি হয়। আর এই কাঠামোর রকমভেদই এক একটি মেরুদণ্ডী প্রাণী এক এক রকমের দেখতে হয়।

দুটো প্রতিবেশী অস্থি যেখানে একে অপরের সঙ্গে লিগামেন্ট দিয়ে বাঁধা থাকে সেই জায়গাটাকেই বলে অস্থিসন্ধি বা হাড়ের জোড়। অনেক মাংসপেশি, আবার টেনডন নামের স্থিতিস্থাপক আর একধরনের দড়ি দিয়ে ওই অস্থিসন্ধিগুলোর সামনে, পেছনে বা যে-কোনো পাশ দিয়েই ওপরের অস্থি ও নীচের অস্থির সঙ্গে বাঁধা থাকে।

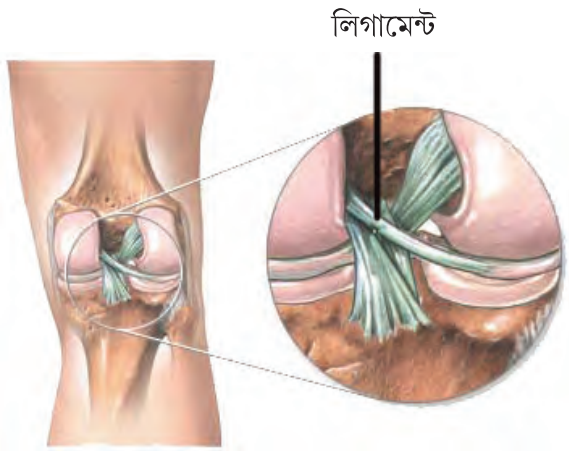

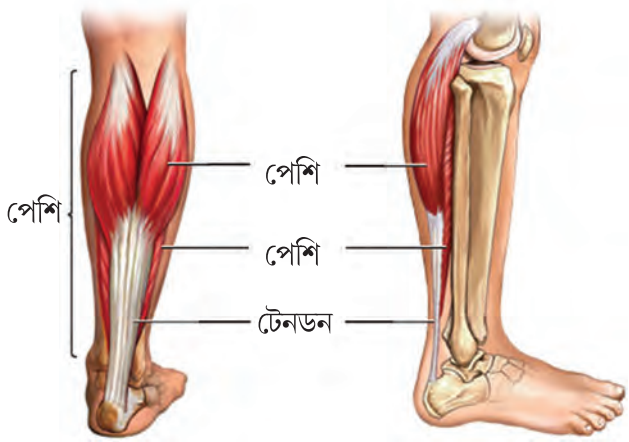

- এমন একটা সন্ধি দেখাও যেটা একদমই নড়াচড়া করে না।

  তোমার খুলির ভিতরে এরকম অস্থিসন্ধি আছে। — এরা হলো অচল অস্থিসন্ধি।

- এমন আরো একটা সন্ধি দেখাও যেটা অল্পঅল্প নড়াচড়া করে।

  কঙ্কালে আর কোথায় কোথায় এরকম অস্থিসন্ধি দেখা যায়?
  — এরা হলো ঈষৎ সচল সন্ধি।

- ছবিতে এমন একটা জোড় দেখাও তো, যেটা অনেকটা নড়াচড়া করে।

- এমন আরো দুটো সন্ধির নাম লেখো।

  — এরা হলো সচল অস্থিসন্ধি (এই ধরনের সন্ধির ভিতর এক ধরনের তৈলাক্ত তরল থাকে। আর সেই তরল পদার্থটা ঘিরে থাকে একটা খোলসের মতো আবরণ যাতে তরলটা অস্থিসন্ধি থেকে বেরিয়ে না যায়। এই ধরনের সচল সন্ধি অনেকরকম হতে পারে।)।

- মানবদেহে অধিকাংশ অস্থিসন্ধি দুটি হাড় নিয়ে তৈরি হলেও কোনো কোনো অস্থিসন্ধিতে দুইয়ের বেশি হাড় থাকে। এরকম দুটি অস্থিসন্ধি চিহ্নিত করো।

নীচের ছবিগুলিতে অস্থিসন্ধিগুলো চিহ্নিত করো এবং কোনটি কোন ধরনের অস্থিসন্ধি তা উল্লেখ করো।

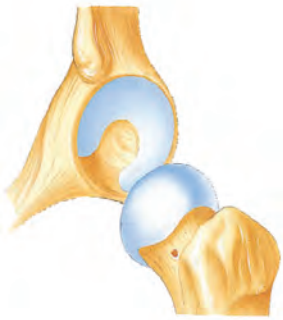

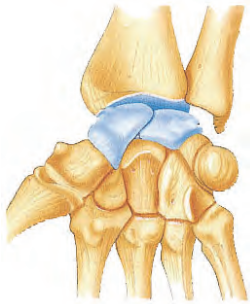

এবার নীচের ছবিগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সচল অস্থিসন্ধিগুলোর অবস্থান লক্ষ করো এবং কোন কোন জায়গায় তা আছে ছবির পাশে বাক্সে দেখাও।

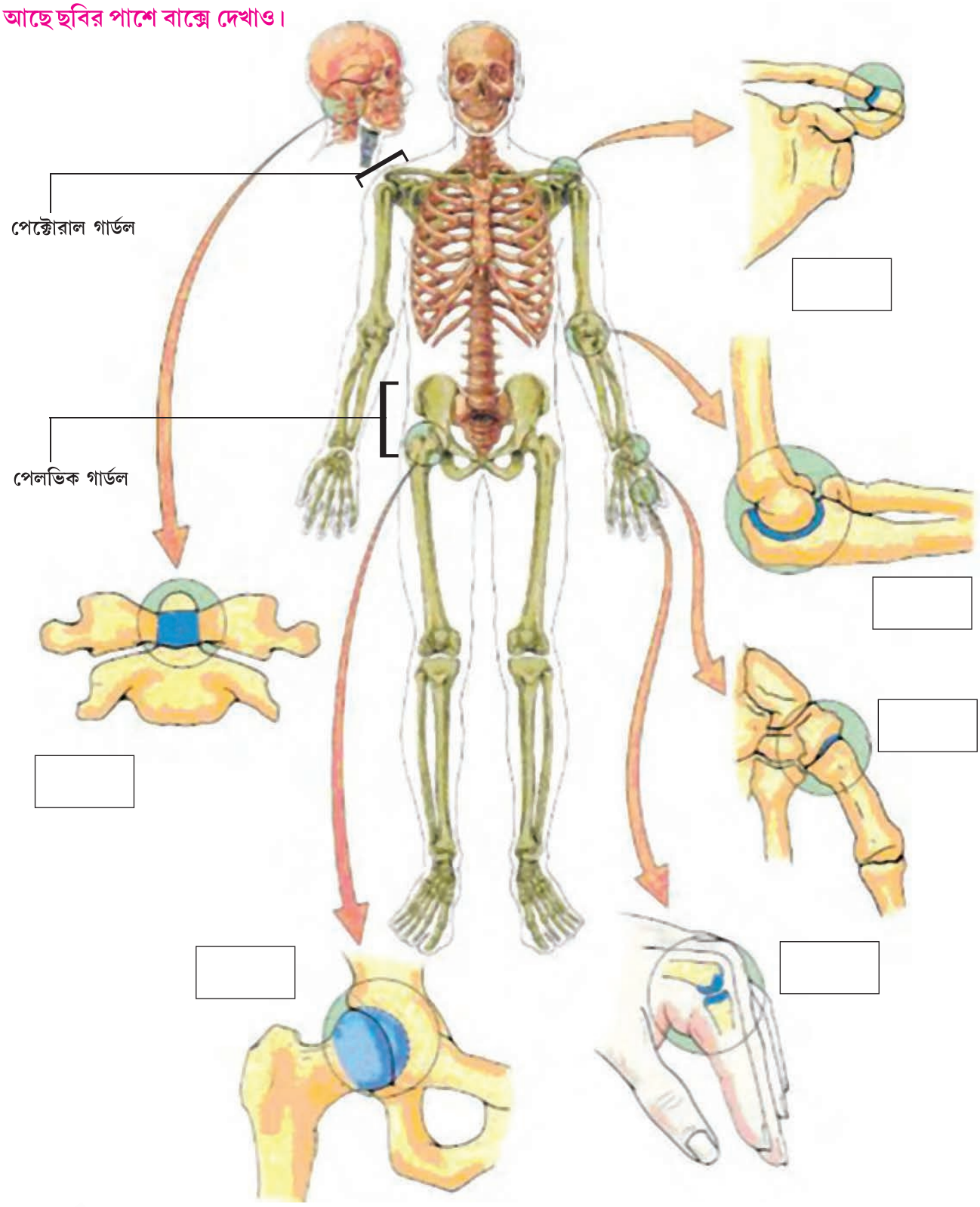

যখনই আমাদের মস্তিষ্ক থেকে নির্দেশ আসে তা স্নায়ুপথ দিয়ে মাংসপেশিতে পৌঁছোয়। পৌঁছোনো মাত্রই নির্দিষ্ট মাংসপেশি সংকুচিত হয়ে ছোটো হলেই অস্থিসন্ধির প্রতিবেশী অস্থিগুলি যে-কোনো দিকে সঞ্চালিত হয় — সামনে, পিছনে, পাশে বা কখনও মোচড় দিয়ে ঘুরে। এটাই হলো অস্থিসন্ধির বিচলন। পাশের ছবিগুলিতে কয়েকটা উদাহরণ দেখা যাক।

অস্থিসন্ধির বিচলনের এসো কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক।

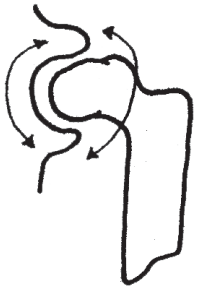

1. বল এবং সকেট সন্ধি (Ball and Socket): এই ধরনের অস্থিসন্ধি দেখা যায় কাঁধে ও কোমরে। যেমন কোমরের অস্থিসন্ধিতে পায়ের উপরের হাড় বা ফিমার (Femur) ওপরদিকটা একটা গোলক বা বলের মতো, সেই অংশটা শ্রোণীচক্রের (Pelvic Girdle) দু-পাশে গাছের কোটরের মতো অংশে ঢুকে থাকে। ফলে কোমর থেকে পায়ের বিচলন সামনে-পিছনে, ডানে-বাঁয়ে সবদিকেই হয় এমনকি তা অনেকটা চরকির মতো ঘোরানো সম্ভব হয়।

2. হিঞ্জ সন্ধি (Hinge Joint): দরজা বা জানলা কবজার মতো এই রকমের সন্ধি থাকে আমাদের হাঁটুতে বা কনুইতে। এখানে যে-কোনো একটা প্রতিবেশী অস্থির যেমন, পায়ের ফিমারের সাপেক্ষে হাঁটুর নীচের দুটি লম্বা অস্থি জঙ্ঘাস্থি (Tibia) এবং অনুজঙ্ঘাস্থি (Fibula) কেবলমাত্র পিছনে ভাঁজ হতে পারে, সামনে নয়। তেমনই কনুইতে হাত ভাঁজ করা যায় কেবল সামনের দিকে, পিছন দিকে নয়।

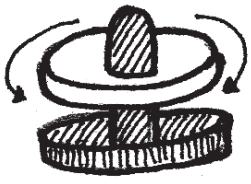

3. পিভট সন্ধি (Pivot Joint): এই ধরনের অস্থিসন্ধিতে একটি প্রতিবেশী অস্থিকে অক্ষ করে অপর অস্থিটি ঘুরতে পারে। যেমন, আমাদের মেরুদণ্ডের গলা অংশের দু-নম্বর কশেরুকার অক্ষ বা কীলক-দণ্ডের চারধারে আবর্তিত হয় এক নম্বর কশেরুকা বা অ্যাটলাস; ফলে আমরা মাথা ঘুরিয়ে এদিক সেদিক দেখতে পারি সহজেই।

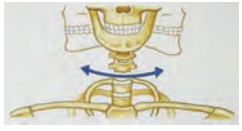

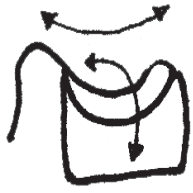

4. স্যাডল সন্ধি (Saddle Joint): ঘোড়ার পিঠে বসবার জন্য চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয় জিন বা পর্যাণ। এতে যখন অশ্বারোহী বসেন, তিনি সামনে-পিছনে বা পাশাপাশি একটি অবতল (Concave) ও উত্তল (Convex) তলে নড়াচড়া করতে পারেন সহজেই। আমাদের হাতের বুড়ো আঙুল দুটিতে এধরনের সন্ধি আছে তাই বুড়ো আঙুল সহজেই সামনে-পিছনে বা ভেতর ও বাইরের দিকে চলাচল করতে পারে।

নীচের ছবিগুলির অস্থিসন্ধির বিচলনগুলি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট ধরণের অস্থিসন্ধির নাম লেখো। ওই ধরনের অস্থিসন্ধিগুলোতে কী ধরনের বিচলন তুমি দেখতে পাচ্ছ তা নীচে লেখো।

এসো, মানবদেহের অস্থিসন্ধিগুলো নিয়ে নীচের সারণিটি পূরণ করতে পারো কিনা দেখো।

কোন জায়গার অস্থিসন্ধি	কোন ধরনের অস্থিসন্ধি	কোন কোন হাড় দিয়ে তৈরি	কেমনভাবে নড়াচড়া করে	তুমি ওই হাড়-জোড়া দিয়ে কী কী কাজ করো

[এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারো: সোজাসুজি খোলে ও বন্ধ হয়, খোলে, প্রায় 90° খোলে, 180° খোলে, চরকির মতো ঘুরতে পারে, অল্প চলে, অনেকটা চলে।]

অস্থিসন্ধির কার্যপদ্ধতি ও অবস্থান দেখে এবার নীচের সারণিটি পূরণ করো।

কাজের নাম	কোন কোন অস্থিসন্ধি কাজ করে	কী কী প্রকারের অস্থিসন্ধি
1. চাষিদের ধান রোওয়া		
2. গাড়ির ড্রাইভারের ব্রেক কষা		
3. রাঁধুনির হাতা-খুন্তি দিয়ে কড়াইতে হাত নাড়ানো		
4. কলম দিয়ে লেখা		
5. ক্রিকেট খেলায় বল ছোঁড়া		
6. পাখির ঘাড় ঘোরানো		
7. সাইকেল চালানো		

পাখির মাথার বিচলন ও মানুষের মাথার বিচলনে কোনো পার্থক্য কী তোমার চোখে পড়ে? এর পিছনে কী কারণ আছে বলে তোমার মনে হয়? প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে নিতে পারো ।

অস্থিসন্ধির সমস্যা

1. রজতের বাবা ইদানীং সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার সময় লক্ষ করছেন হাঁটুটা কেমন যেন শক্ত লাগছে। আর বেশি হাঁটাহাঁটি করলেই হাঁটুটা লাল হয়ে ফুলে ওঠে।
2. সোমার মা, সইদুলের আব্বা আর দীপার ঠাকুমার প্রায়ই কোমর, হাতের আঙুল আর কাঁধের অসহ্য যন্ত্রণা হয়। হাঁটতে খুব কষ্ট হয়। মাঝেমাঝে জ্বরও আসে।
3. অনীকের শখ হলো কম্পিউটারে গেম খেলা। দীর্ঘক্ষণ খেলার পর যখন ও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, পিঠে তখন অসহ্য ব্যথা হয়।
4. আব্বাসের দাদা ক্রিকেট খেলে। হাত ঘুরিয়ে বল করতে গিয়ে দুবার কাঁধের হাড়টা আটকে গেছিল। আর নাড়ানো যায়নি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তারবাবুরা কাঁধের সরে যাওয়া হাড় আবার আগের জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন।

এই ঘটনাগুলি হলো অস্থিসন্ধির নানা সমস্যা।

পেশি

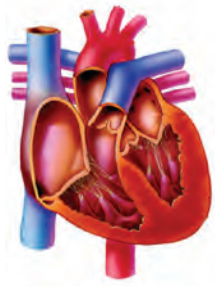

ওপরের ছবিগুলিতে যে যে কাজগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি উল্লেখ করো:

(1) ....., (2) ....., (3) ....., (4) .....

কার কার অংশগ্রহণের ফলে ওপরের ওই কাজগুলি সম্পন্ন হয়? .....। (অস্থি/পেশি/লিগামেন্ট/টেনডন)

পেশির সংকোচন-প্রসারণের ফলেই কোনো জীবের বা অঙ্গের নড়াচড়া সম্ভব হয়। এবার পেশির বৈশিষ্ট্যগুলি জানো।

(1) পেশি টানার কাজ করে।

(2) পেশি যখন কাজ করে তখন তার দৈর্ঘ্য কমে।

তুমি কোথায় কোথায় পেশি দেখেছ লেখো তো।

(1) তোমার দেহে — (i) ....., (ii) ....., (iii) .....

(2) তোমার বন্ধু বা অন্য কারো দেহে — (i) ....., (ii) ....., (iii) .....

(3) অন্য কোনো প্রাণীর দেহে — (i) ....., (ii) ....., (iii) .....

(4) কোনো খাবারের জিনিসে — (i) ....., (ii) ....., (iii) .....

এবার এসো, পেশির কাজ কী, আর তা কীভাবে করে দেখি।

তোমার বন্ধুকে তার বাঁ হাতটা পুরো ঝুলিয়ে দাঁড়াতে বলো। কনুই থেকে হাতটা ভাঁজ করতে বলো (ছবি দেখো); এবার তীরচিহ্ন দেওয়া অংশের ওপরে হাত রাখো। যা অনুভব করছ ওটাই পেশি।

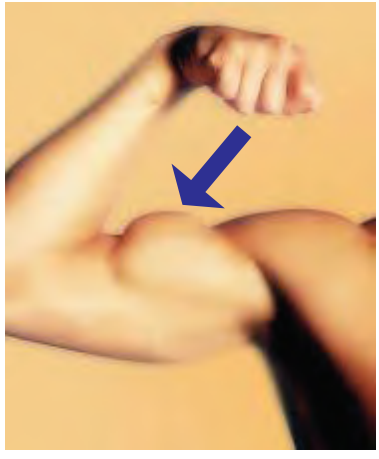

পেশিটা টিপে দেখো, কেমন মনে হচ্ছে।
এবার বন্ধুকে বলো, ধীরে ধীরে কনুইটা ভাঁজ করতে। এই সময়ে পেশিটা আবার অনুভব করো।
পেশিটা আবার টিপে দেখো, এখন কেমন মনে হচ্ছে।
বন্ধুকে হাত নামাতে বলো। তাকে বলো, আবার হাতটা আস্তে আস্তে ভাঁজ করতে।
হাত দিয়ে অনুভব করে আর চোখে দেখে বোঝার চেষ্টা করো, পেশিটা লম্বায় ছোটো হচ্ছে, না বড়ো হচ্ছে, আর চওড়ায় মোটা হচ্ছে, না সরু হচ্ছে।

এবার নীচের সারণিতে ঠিক শব্দগুলোকে বেছে নিয়ে লেখো।

পেশির আকার	যখন হাত তুলছে এই সময়ে কিছু পেশি কাজ করে, অন্য পেশি বিশ্রাম করে	যখন হাত নামাচ্ছে এই সময়ে ওই পেশিগুলি বিশ্রাম করে, অন্য পেশি কাজ করে
কাজ করা পেশির দৈর্ঘ্য	কমছে/ বাড়ছে	কমছে/ বাড়ছে
কাজ করা পেশির প্রস্থ	কমছে/ বাড়ছে	কমছে/ বাড়ছে
কাজ করা পেশির কাঠিন্য	কমছে/ বাড়ছে	কমছে/ বাড়ছে

তাহলে হাতের ওই পেশিটা কী কাজ করছে? .....।

কাজ করার সময়ে পেশির কীরকম পরিবর্তন হচ্ছে? .....।

বিশ্রাম করার সময়ে পেশির কীরকম পরিবর্তন হচ্ছে? .....।

পেশি এইভাবেই কাজ করে। আচ্ছা, পেশি হাতটাকে টেনে তুলছে কী দিয়ে? কনুইটাকে মাঝামাঝি ভাঁজ করে কনুইয়ের মাঝখানে হাত দাও, দু-পাশ দিয়ে আঙুলে ধরে দেখো।

এই দড়ির মতো অংশটির নাম পেশিবন্ধনী বা টেনডন। এটি পেশির সঙ্গে হাড়কে যুক্ত করে। পেশি এটা দিয়েই হাড়কে টেনে তোলে।

এবার তোমার দেহে আর তোমার বন্ধুর আর কয়েকটি পেশির কাজ নিজে খুঁজে বার করো। তার পেশিবন্ধনীগুলি খুঁজে বার করার চেষ্টা করো।

1. হাতে ..... 2. পায়ে ..... 3. ঘাড়ে .....

এসো তো দেখি, সব পেশিগুলি একরকম কিনা?

একটা হলো হাতের পেশি; দ্বিতীয়টা হলো পাকস্থলীর গায়ের পেশি; তৃতীয়টি হলো আমাদের হৃৎপিণ্ডের পেশি। নীচের ছকে মেলাও :

কোথাকার পেশি	সবসময়ে কাজ করে কিনা	কখন কাজ করে	তোমার ইচ্ছেমতো কাজ করানো যায় কিনা
1. হাতের পেশি			
2. পাকস্থলীর পেশি			
3. হৃৎপিণ্ডের পেশি			
4.			

হাতের পেশিকে বলা হয় কঙ্কাল পেশি। কেন বলে বলো তো? .....।

পাকস্থলির পেশি হলো আন্তরযন্ত্রীয় পেশি (আন্তরযন্ত্র মানে বুক আর পেটের ভেতরের অঙ্গগুলো)। এমন নাম কেন? .....।

হৃৎপিণ্ডের পেশিকে বলা হয় হৃৎপেশি। এই পেশির বৈশিষ্ট্য কী? .....।

এখন বলো তো নীচের কাজগুলি কোন কোন রকমের পেশির দ্বারা সম্পন্ন হয় —

কাজের নাম	**পেশির প্রকৃতি** (কঙ্কাল পেশি/আন্তরযন্ত্রীয় পেশি/হৃৎপেশি)
ফুসফুসের সংকোচন-প্রসারণ	
চোয়ালের নড়াচড়া	
খাদ্যনালীর মধ্যে দিয়ে খাদ্যের চলাচল	
রক্তনালীর মধ্যে দিয়ে রক্তের চলাচল	
জিভের নড়াচড়া	
হৃৎপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণ	
চোখ খোলা ও বন্ধ করা	
কোদাল চালানো	
সুইচ অন বা অফ করা	
কথা বলা	
পাহাড়ে ওঠা	
সাঁতার কাটা	

পেশির সমস্যা

1. অণিমার বোনের কোমরের নীচে জন্মের পর থেকেই সাড়া নেই। পা-গুলো খুব সরু সরু।
2. চিরঞ্জিৎ আজকাল ওর লেখালেখির কাজ কম্পিউটারে বসেই করে। দীর্ঘসময় ধরে ওকে বসে থাকতে হয়। পিঠে ও ঘাড়ে ইদানীং ওর একটা ব্যথা হচ্ছে।
3. অসিতবাবুর ইদানীং চোখের পাতা নাড়াতে খুব কষ্ট হয়। হাত ও পায়ের পেশি খুব দুর্বল। বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা। চলাফেরা করতে খুব কষ্ট হয়।

এই ঘটনাগুলোই হলো পেশি সংক্রান্ত নানান সমস্যা।

শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশ

অঙ্গের পরিচিতি

মাধুরী এখন এক বছরের। এইতো সেদিন জন্মাল। নয়নের ছোটোবোন। প্রথমদিন মাধুরীর হাত-পা-গুলো খুব ছোটো দেখেছিল। নয়ন ওর একটা আঙুল নিয়ে দেখেছিল। কি নরম! মাধুরী তখন দাদার আঙুলটা ধরতেই পারেনি। আর ধরবেই বা কী করে। ওর কি এত জোর হয়েছে? নয়ন ওর হাতের দিকে তাকায়। সত্যিই তো, ওর হাতে ও পায়ে এখন কত জোর।

আচ্ছা, তোমরা নীচের অঙ্গগুলো দিয়ে কী কী কাজ করো তা দলে মিলে চটপট করে ফেলো তো।

অঙ্গের নাম	কাজ
1. হাত 2. আঙুল 3. দাঁত 4. কাঁধ 5. হাঁটু 6. পা	

ক্রমবিকাশ

দেখেছ তো তোমরা তোমাদের শরীরের নানা অঙ্গ দিয়ে কতরকম কাজ করতে পারো। নীচের তালিকায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অনুপাত করে ফেলো (স্বাভাবিক বৃদ্ধি হলে)।

বয়স	উচ্চতা (সেমি)	ওজন (কেজি)	অঙ্গের নাম	পরিমাপ (সেমি)	মাথা : হাত:দেহকাণ্ড:পা পরিমাপের অনুপাত
তিন বছর	95	14	মাথা	46.8 - 50.8	
			হাত	16-17	
			দেহকাণ্ড	12-13	
			পা	20-22	
ছয় বছর	113	20	মাথা	49	
			হাত	50	
			দেহকাণ্ড	40	
			পা	65	
নয় বছর	131	30	মাথা	51	
			হাত	59	
			দেহকাণ্ড	50	
			পা	71	
বারো বছর	149	40	মাথা	51	
			হাত	66	
			দেহকাণ্ড	55	
			পা	92	

অনুপাতগুলির মধ্যে তুলনা করো। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

তোমরা তো দেখলে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে শরীরের বিকাশ ঘটে। কথা বলা ও মনের ভাবপ্রকাশেরও বিকাশ ঘটে। শরীর ও মনকে স্বাস্থ্যকর করে গড়ে তুলতে গেলে দরকার পুষ্টিকর খাবার। সকাল-দুপুর-বিকাল-রাত্রে পরিমাণ মতো খাবার না খেলে শরীরের যেমন বৃদ্ধি হয় না, তেমন মনের বিকাশও বাধা পায়।

এসো আমরা আমাদের শ্রেণিকক্ষের সকল ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতা ও ওজন মেপে দেখি। তোমাদের লাগবে একটা স্কেল আর একটা ওজন মাপার যন্ত্র ও উচ্চতা মাপার ফিতে বা স্কেল।

ছাত্রছাত্রীর নাম	ওজন (কেজি)	উচ্চতা (সেমি)

দেখো তো, ক্লাসে তোমাদের উচ্চতা আর ওজন কেমন বাড়ে কমে? নীচের ছকে লেখো।

উচ্চতা (সেমিতে মাপা)

	137 সেমির কম	137-139	139-141	141-143	143-145	145-147	147-150
কতজন আছে							

ওজন

	30 কেজির কম	30-32কেজি	32-34কেজি	34-36 কেজি	36-38 কেজি	38-40 কেজি	40 কেজির বেশি
কতজন আছে							

তাহলে বলো তো, কোন খোপের ওজনের আর কোন খোপের উচ্চতার ছাত্রের সংখ্যা তোমার ক্লাসে সবচেয়ে বেশি?

এটাই তোমার ক্লাসের গড় উচ্চতা আর গড় ওজন।

আমরা আমাদের চারপাশে নানাধরনের মানুষ দেখতে পাই। তাদের নানারকমের স্বাস্থ্য। কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ রোগা বা কেউ মোটা। কেউ আবার স্বাভাবিক গড়ন, কারোর অস্বাভাবিক। যেমন ধরো দৈত্যাকার গঠন (জাইগ্যান্টিজম)। আবার কারোর মধ্যে রয়েছে বামনত্ব (ডোয়ারফিজম)।

রহিমের ছোটোবেলা থেকেই হাত-পা খুব লম্বালম্বা। বয়স যত বাড়তে লাগল অন্যান্য সমবয়সিদের তুলনায় ওর উচ্চতা অনেকটাই বেড়ে গেল। ডাক্তারবাবু ওকে দেখে বললেন রক্তে কোনো একটা রাসায়নিক পদার্থের ক্ষরণ বেড়ে যাওয়ার জন্যই নাকি এই অবস্থা। আবার কুণালের হাত-পা খুব ছোটো ছোটো। যদিও ও রহিমের সমবয়সি। ওর রক্তে ওই রাসায়নিক পদার্থের ক্ষরণ নাকি খুব কম। আবার, সুনীল ওদের তুলনায় একদম স্বাভাবিক। ডাক্তারবাবু বললেন উচ্চতা অনুযায়ী সুনীলের ওজন একদম ঠিক ।

নানা কারণে অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে পারে। কখনও যথেষ্ট খাবার না পেলে, কখনও বা বেশি খাবার খেলে, কখনও বা কোনো রোগের বা বংশগত অস্বাভাবিকতার কারণে তা হতে পারে।

তোমরা তোমাদের এলাকায় কী কী ধরনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখেছ তার তালিকা তৈরি করো। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের কারণ অনুসন্ধান করো।

অস্বাভাবিক বৃদ্ধির লক্ষণ	অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ	রোগটির নাম
	রক্তে কোনো একটা রাসায়নিক পদার্থের ক্ষরণ বেড়ে যাওয়া	জাইগ্যানটিজম
		ডোয়ারফিজম

অপুষ্টির কারণেও নানা অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। এসো ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে খুঁজে দেখি। যার রোগের লক্ষণ আছে তাতে টিক দাও।

নাম	নখের কোণা ভাঙা	দাঁতের সাদা ছোপ	চোখের কোণ ফ্যাকাশে	ত্বকের বর্ণ	হাড়ের আকৃতির পরিবর্তন	প্রায়ই হাড় ভেঙে যাওয়া	ঠোঁটের কোণে ঘা ও জিভে ঘা	মাড়ি ফোলা ও ফেটে রক্ত পড়া
সম্ভাব্য কারণগুলি হলো	ক্যালশিয়ামের অভাব, ফ্লুওরাইডের বিষক্রিয়া	ফ্লুওরাইডের বিষক্রিয়া	লোহা, ভিটামিন বি-এর ও প্রোটিনের অভাব	অপুষ্টি ও প্রোটিনের অভাব	ক্যালশিয়াম ও প্রোটিনের অভাব	ক্যালশিয়াম -এর অভাব	ভিটামিন বি-এর অভাব	ভিটামিন সি-এর অভাব

শরীর মোটা হয়ে গেলে বা বেশি খেলে শরীরে চর্বি জমতে থাকে। একেই আমরা বলি স্থূলত্ব (obesity)। এর ফলে শরীরে নানা রোগ হয়। মনের রোগও হতে পারে।

তোমরা তোমাদের স্কুলের/পাড়ার বিভিন্ন বয়সিদের মধ্যে এধরনের সমস্যা আছে কিনা তা দেখে নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

নাম	উচ্চতা (মি)	ভর (কেজি)	দেহভরসূচক ভর/(উচ্চতা)^2	রোগের নাম	রোগের লক্ষণ
			32	রক্তচাপ বেশি	একটুতেই হাঁফিয়ে যাওয়া, মাথা ঘোরা,মাথা ও ঘাড়ে ব্যথা, রুক্ষ মেজাজ

দেহভর সূচক নির্ণয় - সুস্থতার ধারণা

1. প্রথমে তোমার বন্ধুর ওজন নাও। ধরা যাক তোমার বন্ধুর ওজন 40 কেজি।

2. তারপর তোমার বন্ধুর উচ্চতা মাপো। ধরা যাক তোমার বন্ধুর উচ্চতা 4 ফুট।

3. এবার উচ্চতার একককে মিটারে পরিণত করো। সুতরাং 4 ফুট = 1.22 মি.। [জেনে রাখো, 1 ফুট = 0.3048 মি.]

এবার তোমরা সহজেই শিক্ষিক-শিক্ষিকার সাহায্যে দেহভর সূচক নির্ণয় করতে পারবে।

দেহভর সূচক $= \frac{\text{ওজন}}{(\text{উচ্চতা})^2}$; ওজন আমরা কেজিতে লিখব, আর উচ্চতা লিখব মিটারে।

সুতরাং তোমার বন্ধুর দেহভর সূচক হলো $= \frac{40}{(1.22)^2} = 26.87$

এবার পাশের চার্টটি মিলিয়ে দেখো :

আশঙ্কাজনকভাবে কম ওজন:	দেহভর সূচক 15-র কম
কম ওজন	: দেহভর সূচক 16-18.5
স্বাভাবিক ওজন	: দেহভর সূচক 18.5-25
বেশি ওজন	: দেহভর সূচক 25-30
মোটা হয়ে যাওয়া (স্থূলত্ব)	: দেহভর সূচক 30-40 বা তার বেশি

তাহলে দেখছ তো তোমার বন্ধুর ওজন কিন্তু উচ্চতা অনুযায়ী অনেক বেশি।

এখন থেকেই তার সাবধান হওয়া দরকার। না হলে নানারকম সমস্যা হতে পারে- হৃৎপিণ্ডের রোগ, হাড়ের রোগ, যকৃতের রোগ।

এছাড়াও আর কী কী সমস্যা হতে পারে তা শিক্ষক বা শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

1. ..... 2. ..... 3. .....।

তোমরা দেখলে তো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে শরীরের বৃদ্ধি ঘটে। তবে এই বৃদ্ধি ছেলে ও মেয়েদের বেলায় আলাদা আলাদা। মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি বেড়ে যায় সাড়ে আট থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত। শারীরিক বৃদ্ধির গতি থেমে যায় সতেরো আঠারো বছর বয়সে। তবে ছেলেদের বেলায় এই বিকাশ শুরু হয় একটু দেরিতে। প্রায় দশ বছর বয়স থেকে চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত। এক্ষেত্রে বিকাশ থেমে যায় একুশ বছর বয়সে। বংশগত কারণ ও সঠিক পুষ্টি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে দেহের পরিবর্তন ঘটে। উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।

শরীরের ওজন শুধুমাত্র চর্বি জমে বাড়ে না, হাড় এবং পেশি বৃদ্ধির ফলেও ঘটে। চেহারা রোগা হলেও ওজন স্বাভাবিক হতে পারে।

নানা কারণে হাড়ের রোগ হয়। ফলে শারীরিক বিকাশও বাধা পায়। হাত ছোটো, দু-পায়ের ফাঁকের মধ্যে অস্বাভাবিক দূরত্ব, গলা লম্বা, হাত পা বাঁকা — এরকম নানা সমস্যা হতে পারে। এছাড়া হৃৎপিণ্ড, চোখ, নাক, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদির বিকাশেও নানারকম ত্রুটি দেখা যায়। পুষ্টির অভাব ও পরিবেশগত নানা কারণে এইসব সমস্যার সৃষ্টি হয়।

9 সাধারণ যন্ত্রসমূহ

যন্ত্রের ধারণা

প্রত্যুষ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠল। তারপর **প্যাঁচ দেওয়া ঢাকনি** খুলে দাঁত মাজার মাজনের পাত্র থেকে মাজন নিল এবং **ব্রাশ** দিয়ে দাঁত মাজল। **টিউবওয়েলের (চাপা কল) হাতলে** চাপ দিতেই কলের মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। সেই জলে ও মুখ ধুলো। এরপর মা ওকে সুচে সুতো পরিয়ে দিতে বললেন। প্রত্যুষ **সুচে সুতো** পরিয়ে দিল। তারপর **কলমটা** বের করে লিখতে বসল। কিন্তু বারান্দায় গিয়ে দেখে বাবা **হাতুড়ি** দিয়ে দেয়ালে একটা পেরেক পুঁতছেন। তখন হঠাৎই ওর মনে পড়ে গেল, ওর চেয়ারেও একটা **স্ক্রু** ঢিলে হয়ে গেছে। বাবাকে জানাতেই বাবা **স্ক্রুড্রাইভার** দিয়ে স্ক্রুটাকে টাইট করে দিলেন। তারপর প্রত্যুষ শুরু করে স্কুলের প্রোজেক্টের কাজ। **ছুরি** আর **কাঁচি** দিয়ে কাগজ কেটে তৈরি করল ফুল। **সাঁড়াশি** দিয়ে তারকে বেঁকিয়ে তৈরি করল গাছের ডাল। আগামীকাল স্বাধীনতা দিবস। খুব মজা। **কপিকলে** দড়ি পরিয়ে জাতীয় পতাকা তোলা হবে। তারপর নিতাই কাকার দোকানের ফলের রস বেশ মজা করে খাওয়া হবে। প্রত্যুষের কিন্তু মজা লাগে **বটল ওপেনার** দিয়ে ওই বোতলের ঢাকনি খুলতে।

- বলতে পারো, মোটা অক্ষরে লেখা জিনিসগুলো কী?

খেয়াল করে দেখো, এই প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের কাজকে কত সহজ করে দেয়। **এই জিনিসগুলোর ওপর তুমি বল প্রয়োগ করো এক জায়গায়, আর কাজ হয় আর এক জায়গায়।**

তুমি কি **শাবল** দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখেছ? শাবলের কোন জায়গায় **বল প্রয়োগ** করা হয়, আর **কাজ** হয় কোন জায়গায়?

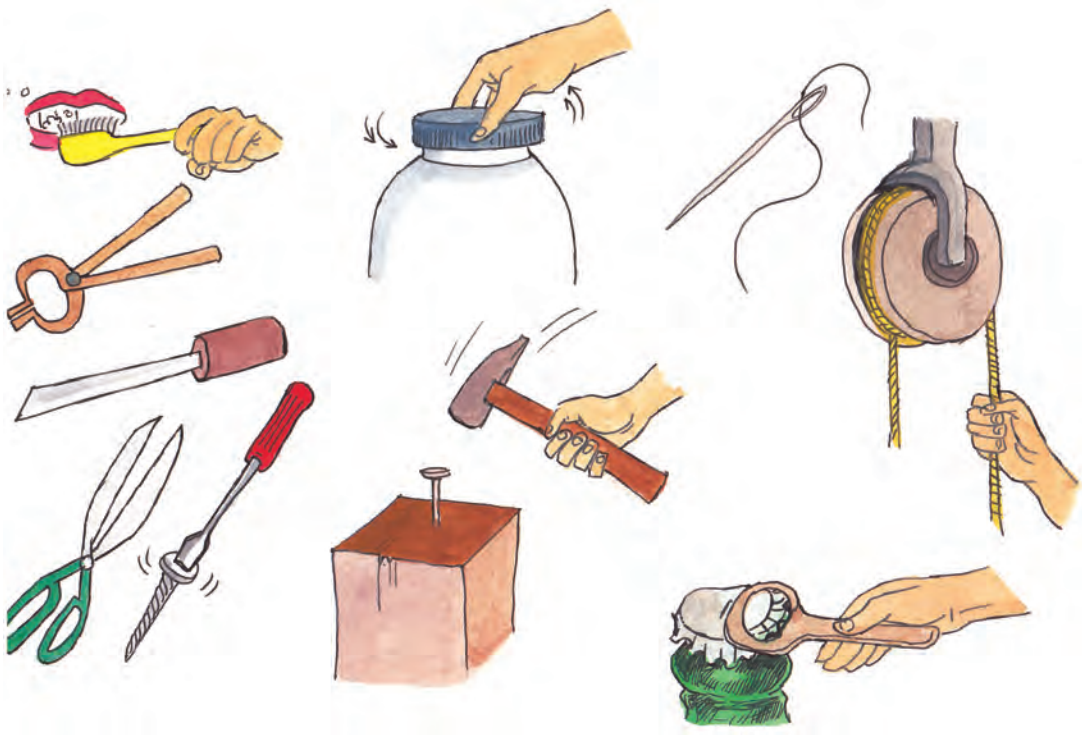

এই জিনিসগুলোকে বলে '**সরল যন্ত্র**'। তুমি এই ধরনের আরো কিছু যন্ত্রের নাম নীচে লেখো।

_____

_____

_____

এরকম দুই বা তার বেশি সরল যন্ত্র নিয়ে তৈরি হয় '**জটিল যন্ত্র**'। যেমন ধরো, '**সেলাইমেশিন**'। ভালো করে লক্ষ করো, একটা সুচের সঙ্গে **আরো কত সরল যন্ত্র মিলে** এই মেশিনটা তৈরি হয়েছে। একটা সুচ দিয়ে একটা একটা করে সেলাই করতে হয়। কত সময় লাগে। কত কষ্ট হয়। আবার প্রতিটি সেলাই সমান নাও হতে পারে। কিন্তু দেখো একটা সেলাইমেশিন দিয়ে কত তাড়াতাড়ি, কত সূক্ষ্মভাবে আর কত সহজে ওই সেলাই-এর কাজ করা যায়।

আসলে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রও ক্রমশ উন্নত হয়েছে। তৈরি হয়েছে **সরল যন্ত্র থেকে জটিল যন্ত্র**। তার থেকে **জটিলতর যন্ত্র**। এভাবে সরল যন্ত্রের হাত ধরেই আবিষ্কৃত হয়েছে কত সব জটিল যন্ত্র। এমনকি '**কম্পিউটার**'। বাড়িতে, অফিসে, স্কুল-কলেজে, হাসপাতালে, কল-কারখানায় আজ প্রায় সর্বত্রই যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়।

এসো, এরকম যন্ত্রের একটা তালিকা বানাই। শূন্যস্থানে শব্দভাণ্ডার থেকে উপযুক্ত শব্দ বসাই।

সরল যন্ত্র	জটিল যন্ত্র
সুচ	সেলাই যন্ত্র
কলম	ছাপার যন্ত্র (ম্যানুয়াল, অফসেট)
করাত, ছুরি, ব্লেড, কাঁচি	ইলেকট্রিক কাটিং যন্ত্র
ছেনি	ড্রিল যন্ত্র, (দেয়াল ইত্যাদি ফুটো করার জন্য)
শাবল	ভাইব্রেটিং যন্ত্র

শব্দভাণ্ডার — বঁটি, গাঁইতি, সাইকেল, ফ্যান, লাঙল, ট্রাকটর, লেদ মেশিন।

লিভার (Lever)

ছবিতে যেভাবে দেখানো আছে ঠিক সেইভাবে একটি বই, একটি পেন বা পেনসিল ও তোমার ডান ও বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো রাখো। এবার ডান হাতের আঙুল দিয়ে পেনটাকে তোমার নিজের দিকে টানো।

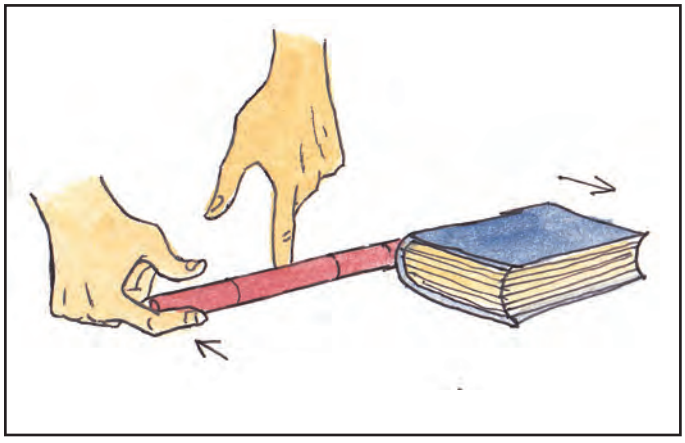

কী দেখতে পেলে? বইটা সরে গেল তো?

এখন তুমি বাঁ হাতের আঙুলটা একটু একটু করে ডান হাতের আঙুলের দিকে আনতে থাকো এবং পরীক্ষাটা করতে থাকো।

কী বোঝা গেল? বাঁ হাতের আঙুল যত ডান হাতের আঙুলের কাছাকাছি আনছ, তত তোমার পেনটা টানতে কষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ তত বেশি বল প্রয়োগ করতে হচ্ছে।

এবার, বাঁ হাতের আঙুলটা বই-এর দিকে নিতে থাকো। আর একই পরীক্ষা চালিয়ে যাও। এবারে তুমি ঠিক উলটোটাই দেখতে পাবে।

তুমি যে সরল যন্ত্রটা তৈরি করেছ তার নাম কি জানো? **লিভার**। বইটাকে সরাবার জন্য তুমি পেনের ওপর যে টান প্রয়োগ করেছিল তা হলো **বল**। পেনের অপর প্রান্তে যে বইটাকে সরানো হলো তা **বাধা**।

বাঁহাতের আঙুলটা যেখানে পেনকে স্পর্শ করল, তাকে বলে **আলম্ব**। **এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে লিভার (এখানে পেন) অবাধে ঘুরতে পারে।**

'বল', 'বাধা' ও 'আলম্ব' এই তিনটের অবস্থান ভেদে লিভার তিন রকমের হয়।

(1) **প্রথম শ্রেণির লিভার**

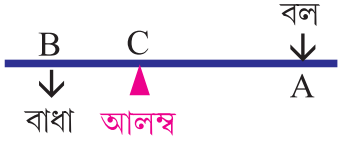

বাধা ও **বল**-এর মাঝামাঝি জায়গায় থাকে **আলম্ব** বিন্দু।

(2) **দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার**

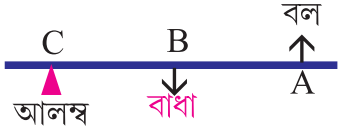

আলম্ব ও **বল**-এর মাঝামাঝি জায়গায় থাকে **'বাধা'**।

(3) **তৃতীয় শ্রেণির লিভার**

আলম্ব ও **বাধা**-র মাঝামাঝি জায়গায় থাকে **'বল'**।

ছবিতে তিন শ্রেণির লিভারে বলের প্রয়োগ বিন্দু (A), বাধার প্রয়োগ বিন্দু (B) ও আলম্ব বিন্দুর (C) অবস্থান লক্ষ কর। তারা কোথায় আলাদা তা আলোচনা কর।

প্রশ্নচিহ্ন (?) অংশটি তুমি পূরণ করো :

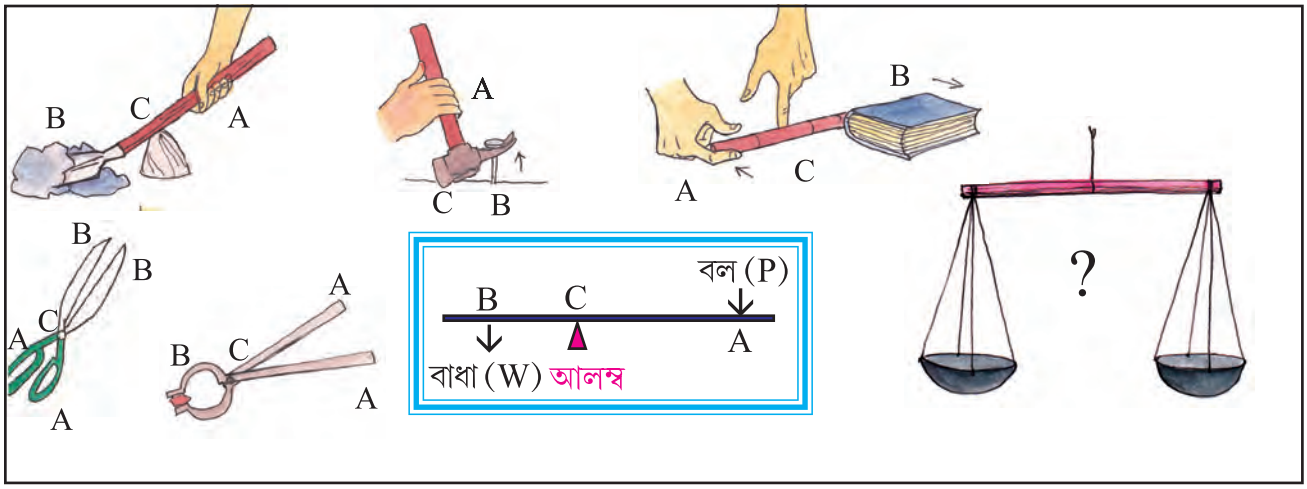

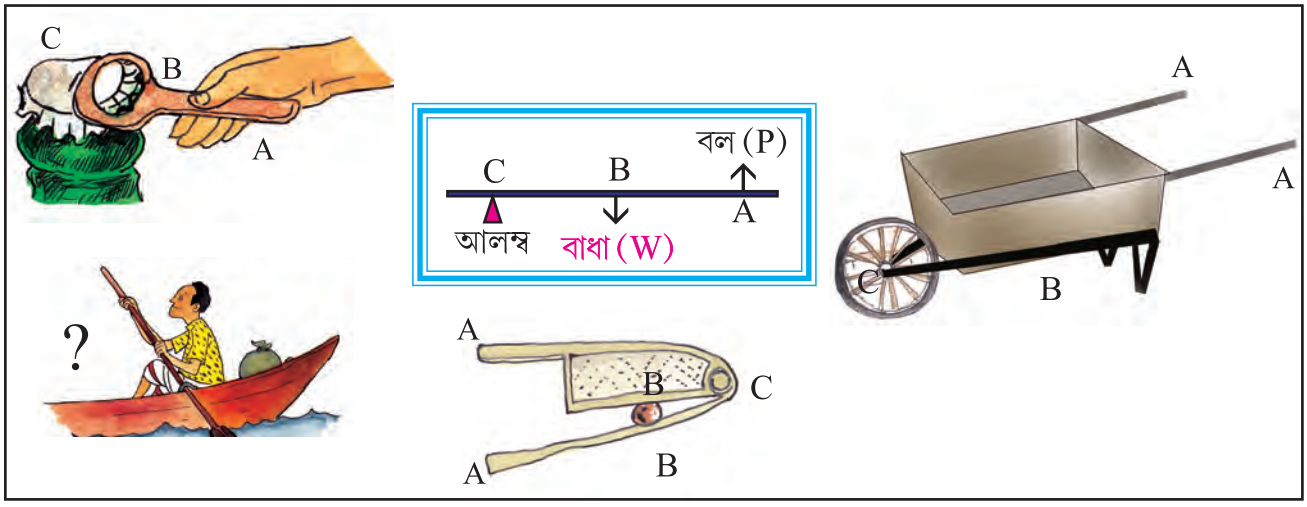

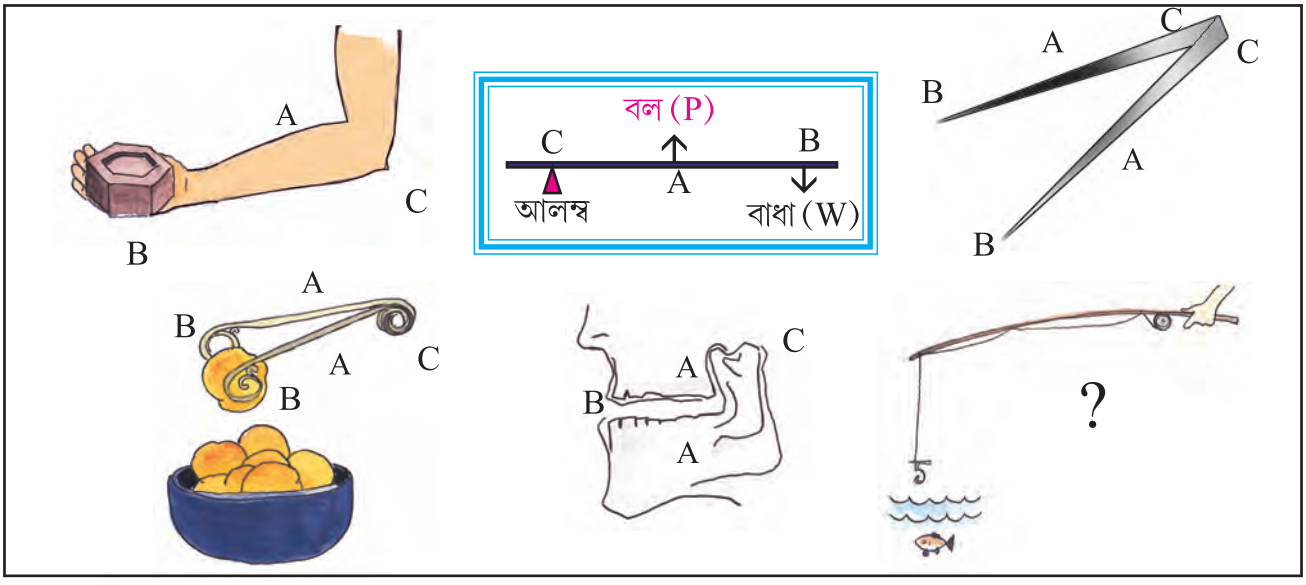

নততলের ধারণা

সঠিক স্থানে '✓' দাও :

পাশের ছবিটা দেখো। এবার ভেবে বলো তো কোনটি বেশি সহজ :

- মাটির সঙ্গে খাড়াভাবে থাকা একটা নারকেল গাছ বেয়ে তোমায় উঠতে হচ্ছে।
  গাছের সঙ্গে হেলিয়ে রাখা মই দিয়ে তোমায় উঠতে হচ্ছে।
- দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠছো।
  অথবা সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠছো।
- সাইকেল চালিয়ে অনেকটা খাড়াই ব্রিজে ওঠা।
  সাইকেল চালিয়ে কম খাড়াই যুক্ত ব্রিজে ওঠা।
- পাশের ছবিটা দেখো। এবার বলো একটা ভারি ড্রামকে খাড়াভাবে চাগিয়ে কি লরিতে তোলা সহজ?

ওই ড্রামটিকে, লরির সঙ্গে হেলানো কাঠের তক্তার ওপর ঠেলে দিয়ে গড়িয়ে তোলা কি বেশি সহজ ?

ভাবো তো সাধারণ সিঁড়ির চেয়ে খাড়াই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে কষ্ট বেশি হয় কেন?

খাড়াই রাস্তা ধরে পাহাড়ে ওঠার চেয়ে আঁকাবাঁকা পথে ওঠা অনেক আরামের কেন?

হেলিয়ে রাখা মই, সিঁড়ি, ব্রিজ, ড্রাম গড়িয়ে ওপরে তোলার জন্য হেলানো কাঠের তক্তা এদের বলে **নততল**।

নততল একটা সমতল পাটাতন বা ওই ধরনের কোনো সমতল যাকে মাটির সঙ্গে সূক্ষ্মকোণ করে রাখা হয়।

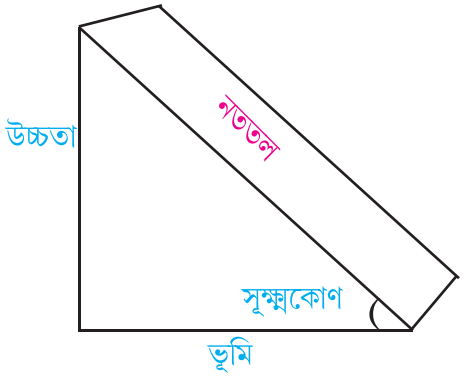

ওপরের অভিজ্ঞতা থেকে তাহলে একথা বলা যায় **নততলের খাড়াই যত কম হবে নততলের সুবিধে তত বেশি হবে। অর্থাৎ ভূমি ও নততলের মাঝের কোণ যত ছোটো হবে নততলের সুবিধা তত বেশি হবে।**

স্ক্রু, পুলি, চক্র ও অক্ষদণ্ড

স্ক্রু

একটা কাঠের ব্লকে একটা পেরেক ও একটা স্ক্রু পুঁততে হবে।

পেরেকটাকে তুমি পুরোটাই হাতুড়ির ঘায়ে কাঠের ব্লকে পুঁতলে। এবার স্ক্রুকে তুমি প্রথমে সোজা করে ব্লকের ওপর ধরলে। তারপর ওর মাথার খাঁজকাটা অংশে স্ক্রুড্রাইভারটা আটকিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাঠের ব্লকে প্রবেশ করালে।

এবার বলো তো, কোনো ক্ষেত্রে তোমার কম বল প্রয়োগ করতে হলো?

কোন ক্ষেত্রে ব্লকটা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি?

কাঠের ব্লকে পুঁতে দেবার পর, পেরেক বা স্ক্রুর মধ্যে কোনটি কাঠের ব্লকে বেশি শক্তভাবে বসে থাকবে?

তাহলে দেখা গেল, **পেরেক অপেক্ষা স্ক্রু-র সুবিধা অনেক বেশি**। এখন প্রশ্ন হলো, কী কারণে স্ক্রু-র সুবিধা পেরেকের চেয়ে অনেক বেশি।

আসলে স্ক্রু-র মধ্যে লুকিয়ে থাকা নততলই এর কারণ।

স্ক্রু-এর গায়ে যে ধাতব প্যাঁচ থাকে তা আসলে একটি **নততল**।

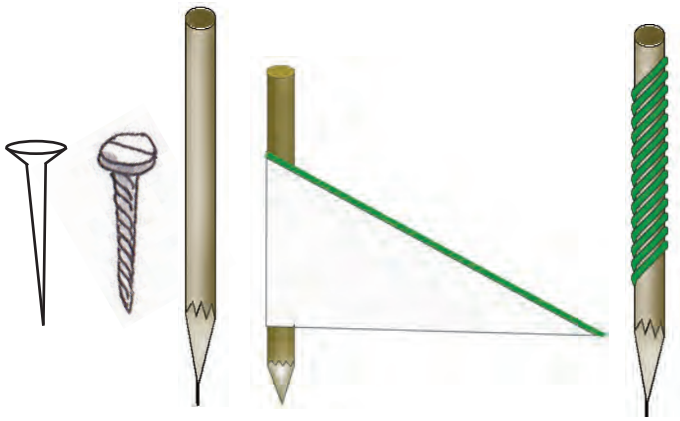

1 2 3

ছবি 1, 2 ও 3-এ তা দেখানো হয়েছে। ছবির মতো করে একটা তিনকোণা কাগজের টুকরো কেটে নাও। ছবিতে দেখো ওই কাগজের যে অংশে সবুজ রং করা হয়েছে তুমিও তাই করো। ওই অংশটা হলো নততলের প্রান্ত দেশ। এবার ছবির মতো করে কাগজটা একটি পেনসিলের গায়ে জড়িয়ে নাও।

কীদেখতে পাচ্ছ? স্ক্রু-এর গায়ের সঙ্গে পেনসিলটার গায়ের মিল পাচ্ছ কি?

স্ক্রু-এর ওই প্যাঁচানো অংশ ধারালোও বটে। ফলে সহজেই তা স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে ঘুরতে ঘুরতে কাঠে বসে যেতে পারে।

পুলি বা কপিকল

ওপরের ছবি দুটো লক্ষ করো। তারপর নীচের প্রশ্নের উত্তর লেখো।

রবির মা কী করছেন?

কীভাবে তা করছেন?

রবির মা কোন দিক থেকে কোন দিকে বল প্রয়োগ করছেন?

রবির মা কী করছেন?

কীভাবে তা করছেন?

রবির মা কোন দিক থেকে কোন দিকে বল প্রয়োগ করছেন?

কোন ক্ষেত্রে রবির মা-র কষ্ট কম হচ্ছে?